সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র দর্শন: মনঃপ্রজ্ঞার সৌন্দর্য ও আনন্দ

রোকসানা গুলশান*

সারসংক্ষেপ : দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনের সময়কে গ্রহণ করে এগিয়েছেন। মনঃপ্রজ্ঞা জীবনকে গ্রহণ করার তেমনই একটি বিজ্ঞানচিন্তা। রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই ওষধীগুণসম্পন্ন ক্ষণকালের ফসল 'ক্ষণিকা'য় চিরকালীন এক সত্যকে তুলে ধরেছেন। নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে ও সচেতনভাবে বর্তমানে ইতিবাচকভাবে সক্রিয় থাকলে বর্তমানই আমাদের অনন্ত সৌন্দর্য উপভোগ ও উপলব্ধির আনন্দ দেয়। এটাই সত্যপথ, এটাই সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথ মনোজাগতিক অনুভবে বর্তমান সময়ের সৌন্দর্য ও আনন্দকে উদযাপন ও উপলব্ধি করেছেন ক্ষণিকায়। প্রবন্ধটি সময়, মন, বা মনঃপ্রজ্ঞা সে সৌন্দর্য ও আনন্দ নিয়ে উপস্থাপিত।

১.

নশ্বর জীবন। নগদেই জীবনের সুখ। বর্তমানকে যদি ছোঁয়া যায়, এর স্বাদ- স্পর্শ শতভাগ অনুভব করা যায়, তবে এই মুহূর্তটা হতে পারে অনন্তের মতোই আনন্দদায়ক। সময় বিধাতার এক অপরূপ রহস্যময় সৃষ্টি। সে একইসাথে পৃথিবীর সমবয়সী প্রাচীন, কখনো আবার চির নবীন। তার যেন কোনো বয়স নেই। অধরা, ছলনাময় ইন্দ্রজাল সে। সময় জাগতিক মানুষের অনুভবেই বিচিত্র আশ্চর্যরূপে ধরা দেয়।

বেশিরভাগ সময় আমরা তার সাথে একাত্ম না থেকে, সময়ের সামনের ধাঁধাময় মায়ালোকে বা পেছনের স্মৃতিলোকে অবস্থান করি। এই অবস্থান সচেতন অবস্থান নয়। এ কারণে আমরা সময়ের বর্তমানতার মধ্যে যে বস্তুগত ও অবস্তুগত আনন্দসম্পদ রয়েছে, তাকে হারাই। যদি সময়ে ষোলআনা সংযুক্ত থাকি তবে সে সময়ের আনন্দ বা সৌন্দর্যের অনুভবে আত্মিকভাবে জেগে উঠতে পারি। নিজেকে নিজের করে শুধু নয়, নিজের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক তখন সত্য করে পাই। সময়ের অনিবার্য শাসনে, জীবনের নিত্যতা তখন হয়ে ওঠে সহজ ।

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি আইন উদ্দীন কলেজ, ফরিদপুর।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.6

রহস্যময় মহাবিশ্বে মানুষ এক জাগতিক রহস্য। মানুষের দেহে আছে লক্ষকোটি পরমাণু। প্রতিটি পরমাণুতে যে শক্তি প্রবহমান, তার সাথে মিশে আছে আলোর অন্তহীন কম্পন। সময়ের মতোই আরেক বিস্ময়কর রহস্য এই আলো । মহাবিশ্ব শুরু হয়েছিলো আলো দিয়ে। পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে, 'আলো কোনো অচেতন শক্তি নয়, বরং অসীম চেতন সম্পন্ন শক্তি' (শারমিন, ২০১৭ : ৭১)। সবচেয়ে দ্রুতগামী এই আলোর প্রসঙ্গেই আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। "মহাবিশ্ব হতে দেহের প্রতিটি পরমাণুতে যে শক্তি প্রবহমান তা তো আলোরই অন্তহীন কম্পন। আলোর গতি অপরিবর্তনীয় এবং জাগতিক সময়ের ঊর্ধ্বে ভ্রাম্যমাণ। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে যদি কোনো বস্তু আলোর গতির কাছাকাছি পৌঁছাতে চায়, সময় তখন বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঐ ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিকদের অনেকেই বললেন যে, কোনো মানুষ যদি সময়হীন অবস্থানে কখনো পৌঁছে, সে অবিনশ্বরতা লাভ করতে বাধ্য। অসীম শক্তিসম্পন্ন আলো হলো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সত্য, এই মতবাদে, উপনীত আইনস্টাইনের অনুসারী বিজ্ঞানীদের অনেকে আলোকে তুলনা করলেন স্রষ্টার সাথে যিনি আলোর মতই সময়ের বাইরে" (শারমিন, ২০১৭ : ৭০)। এই প্রসঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানী জেরাল্ড শ্রয়েডারের (Gerald Schroeder) অভিমত হলোঃ "আইনস্টাইন আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে প্রবহমাণ আলোর স্বাভাবিক পরিণতি হলো অসীম বর্তমানঃ আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকবো" (শারমিন, ২০১৭ : ৭০)।

আসলে সবকিছুর মূলেই আছে চেতনা যা আমাদের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করে। 'সচেতনতাই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে জাগ্রত রাখে...সচেতনতার আরেক অর্থ হতে পারে আলোকচেতনা। এই চেতনাকে নিয়েই মানুষকে পথ চলতে হয়' (রোকসানা, ২০১৫ : ১৩)। যে চেতনা তাকে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে সজাগ ও জাগ্রত রাখে এবং সে অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া করতে তৎপর করে। "অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে বোধগম্যতা ও প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক এবং আলোর গতির চাইতেও দ্রুত" (শারমিন, ২০১৭ : ৭১)। এই আলোকচেতনাই মানবচেতনা ও আনন্দ। "রবীন্দ্রনাথ-চিন্তাদর্শের মূল কথাটাই হলো চৈতন্যের জাগরণ, চেতনার উপলব্ধি" (আকতার, ২০১৮, ৩২)। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্ত্ব (১৩৪০) প্রবন্ধে লিখেছেন, "আমি আছি, এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান। সেইজন্য যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোলে তাতে আমার আনন্দ। ...যা আমার চেতনাকে জাগিয়ে রাখে, সে যতই তুচ্ছ হোক, তাতেই মন হয় খুশি, তা সে হোক-না ঘুড়ি ওড়ানো, হোক-না লাটিম ঘোরানো। কেননা সেই আগ্রহের আঘাতে আপনাকেই অত্যন্ত অনুভব করি" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৬৮)। নিজেকে তিনি বিস্ময়ের পৃথিবীর প্রতিটি অনুপরমাণুর সাথে, জল, স্থল, প্রকৃতির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে একীভূত মনে করেন।

মানুষের মনও প্রকৃতির আরেক বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথ মন সম্পর্কে একটি চিঠিতে লিখেছেন।

"... মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলছে, হুহুঃশব্দে রক্তস্রোত ছুটছে, স্নায়ুগুলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে নড়ছে আর এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে। কোথা থেকে কী হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানি নে" (বিজন, ২০১৩: ২০৫)।

সৌন্দর্যবোধ মানুষের এই মনেরই বিষয়। ১৯৩০ এ প্রকাশিত[১] আইনস্টাইন তাঁর What I Believe নামের প্রবন্ধে বলেছেন, "সবচেয়ে সুন্দর যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করতে পারি তা হলো রহস্যময়তার সৌন্দর্য। এই মৌলিক আবেগটিই খাঁটি বিজ্ঞান আর খাঁটি শিল্পকলাকে লালন করে। এর সঙ্গে যার পরিচয় নেই, যার বিস্ময়বোধ গেছে ফুরিয়ে, যে কোনকিছুতেই চমৎকৃত হয় না, সে তো মৃতেরই শামিল তার চোখ নিষ্প্রভ" (সঞ্জীব, ২০১৪: ১৩০)।

বর্তমান মুহূর্তকে সচেতন ও ইতিবাচকভাবে দেখে, নিরপেক্ষ ও উদারনৈতিক দৃষ্টিতে অনুভব ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করাই হলো মাইন্ডফুলনেস[২]। পারিভাষিকভাবে একে মনঃপ্রজ্ঞা বলতে পারি। মাইন্ডফুলনেস বা মনঃপ্রজ্ঞার অনুশীলনে আত্মউন্নয়নের পথ আলোর গতি পায়। এজন্য প্রকৃতিবোধে বেড়ে ওঠা দরকার। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি থেকেই প্রাণগতি পেয়েছেন। এই প্রাণগতি তাঁকে আত্মশক্তিতে জাগিয়ে রেখে ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে সৃজনশক্তিতে বৃহৎ জীবনপথে চালিত করেছে। যেতে যেতে তিনি অনুভব করেছেন, প্রতি মুহূর্তকে ইতিবাচকভাবে, সুন্দরভাবে দেখা ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই পরমকে অর্জন করা যায়। এটাই হলো আনন্দ। সহজ জীবনদৃষ্টির আনন্দবাদী কবি জীবনকে এক উৎসব মনে করে অগ্রগতির জন্য প্রতিমুহূর্তে সাধনা করে গেছেন। *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থে আমরা সেই মাইন্ডফুল বা মনঃপূর্ণ রবীন্দ্রনাথকেই আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। বর্তমানকে উপভোগ ও উপলব্ধির সরল দর্শনই *ক্ষণিকায়* উপস্থাপিত। সময়, মন এবং মনঃপ্রজ্ঞা এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বৈচিত্র্য নিয়েই আলোচ্য প্রসঙ্গের আলোচনা।

২.

মহাবাউল, দার্শনিক ও বিশ্বভ্রমী মানুষ রবীন্দ্রনাথের জীবনকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। বিশ বছর অন্তর তাঁর জীবনে নবপর্যায় এসেছে। একে বিকাশ পর্ব, বৈচিত্র্য পর্ব, পরিণত পর্ব, শেষ পর্ব হিসেবে ভাগ করা যায়। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী *ক্ষণিকা* প্রকাশিত হয়েছিল ২৬ জুলাই, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে (বৃহস্পতিবার, ১১ শ্রাবণ)। তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। ম্যাক্স প্লাঙ্কের (১৮৫৮-১৯৪৭) কোয়ান্টাম তত্ত্ব, সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) স্বপ্নের ভাষ্য প্রভৃতি এসময় আবিষ্কৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই সময়টায় নানা নতুন কাজে ডুবে ছিলেন। রবীন্দ্রজীবনে এই চতুর্থ দশক সবচেয়ে সফলতম কাল বলা যায়। এসময়ের সোনার ফসলগুলো হলো *সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), কল্পনা (১৯০০), কথা (১৯০০), চৈতালি (১৮৯৬),*

কণিকা (১৮৯৯), *ক্ষণিকা* (১৯০০), *চিত্রাঙ্গদা* (১৮৯২), *মালিনী* (১৮৯৬), *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী* (১ম খণ্ড: ১৮৯১; ২য় খণ্ড : ১৮৯৩), *পঞ্চভূতের ডায়েরি* (১৮৯৭), *বিদায় অভিশাপ* (১৮৯৪), *বৈকুণ্ঠের খাতা* (১৮৯৭) *নরকবাস*, *সতী*, *লক্ষ্মীর পরীক্ষা*, ছোটগল্পের অনেকগুলি, এবং *ছিন্নপত্রাবলী*র পত্রগুচ্ছ।

নীহাররঞ্জন রায় *ক্ষণিকা* প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'কল্পনা'র শেষ কবিতা ১৩০৬ সালের শেষাশেষি রচিত হয় এবং 'নৈবেদ্য' গ্রন্থের প্রথম কবিতা রচিত হয় ১৩০৭ সালের শেষদিকে। 'কল্পনা'র জীবন হইতে 'নৈবেদ্য'র জীবনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক পরিণতি মাঝে যে ধ্যানমৌন গভীর সুগম্ভীর জীবনের আকুতি 'কল্পনা'য় লক্ষ্য করা যায় তাহার পরিণতি 'নৈবেদ্য' হইতেই সূত্রপাত। কিন্তু এই স্বাভাবিক বিবর্তনের মাঝখানে একটি অপরূপ কাব্যগ্রন্থ কয়েকমাসের ফাঁকের মধ্যে একটি স্থায়ী আসনদখল করিয়া বসিয়া আছে; সেটি 'ক্ষণিকা'। 'ক্ষণিকা' নামটি সার্থক। এক জীবন হইতে অন্য জীবনে রূপান্তরের মাঝখানে কয়েকমাসের জন্য ক্ষণিকার মতই 'ক্ষণিকা'র উদয় ও অস্ত। (নীহাররঞ্জন, ১৩৬৯ : ৮৯)

এ সময়টা হলো বৈচিত্র্য পর্ব বা শিলাইদহ পর্ব। অনেকে একে ঐতিহ্যচিন্তা ও গভীরতর মননপর্বও বলেছেন। ড. খনা মুখোপাধ্যায়ের মতে, "এই কাব্যে বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। এখানে রচনার চালটা হালকা। *নৈবেদ্য* এর গভীর চিন্তাগুলি ক্ষণিকাতে সরলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যের আপাত চটুলতার অন্তরালে আছে গভীর ইঙ্গিত" (খনা, ১৯৭৮ : ১১)। "বাংলাদেশের অখ্যাত এক অঞ্চল, অখ্যাত তার কতকগুলি পল্লী, আর পদ্মানদী ছাড়া তার নদীনালা খালবিলগুলোও অখ্যাতপ্রায়– এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ দশকের জগৎ। এই ভূমিখণ্ডে কোন্ আদিম প্রাণের ভূমিকা সঞ্চিত ছিল যার স্পর্শ এক মহাকবিকে তাঁর বিধিনির্দিষ্ট পথের উপরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল" (প্রমথনাথ : ১৪১৫ : ৩৪)। এসময় শিলাইদহে গৃহবিদ্যালয় নিয়ে নানা পরীক্ষা চলেছে। জমিদারিতে অন্যান্য আরও পরীক্ষাও তিনি করে যাচ্ছিলেন। "জীবনকে সম্পূর্ণ ইতিবাচক ভঙ্গিতে দেখা–সবকিছুকে গ্রহণ করা–বহুদিকে পথ খোঁজা– এই ছিল রবীন্দ্রধর্ম। ভারতের মতো নেতির দেশে, সম্পূর্ণ ভারতীয় মাটিতেই শিকড় চালিয়ে দিয়ে এমন সর্বানুভূতির দৃষ্টান্ত বিরল" (সুপ্রিয়, ২০০০ : ৭০)। ব্যবসায়িক গোলযোগ ও ক্ষতির কারণেও রবীন্দ্রনাথের জীবনে সময়টা ছিল মানসিকভাবে অস্থির ও অস্বস্তির। "এই অসোয়াস্তির চাপে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ভাবনাও কিছুদিনের জন্য বাঁক ফিরেছিল। তাঁর ফলে কবিতা ও গল্প রচনায় তিনি হালকা পরিবেশও সহজ সুর আনতে পেরেছিলেন। এর প্রমাণ রয়েছে 'ক্ষণিকার' ও গোড়ার দিকের কবিতায় এবং ১৩০৭ সালে ভারতীতে এবং অন্যত্র প্রকাশিত গল্পগুলিতে" (উজ্জ্বলকুমার, ১৯৯৫ : ৪৪)। উজ্জ্বলকুমারের (১৩৭৫) *ক্ষণিকা* সম্পর্কে অভিমত হলো, *ক্ষণিকা* রবীন্দ্রকাব্যধারায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন, কারণ এখানে তাঁর মেজাজ পূর্বাপর কাব্যধারা থেকে একেবারে আলাদা। সিরাজ সালেকীনের মন্তব্য

হলো, "আপাত-ক্ষণবাদী রবীন্দ্রনাথ সময়বোধের প্রেক্ষাপটে জীবনের নবতর অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন *ক্ষণিকা* কাব্যে... জীবনগতির স্পষ্টতর একটি তীব্রতা আছে এখানে; পরবর্তী কালের গতিমূলক যাত্রার সূচনাও এখানে। এই যাত্রায় আছে আলোর সংস্পর্শ। চলার আনন্দ নিতে ও দিতেই এসেছেন রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ে" (সিরাজ, ২০১১ : ৫৬)।

৩.

কালজয়ী কাব্যগ্রন্থ *ক্ষণিকা* ৬২ টি কবিতার মালায় সজ্জিত। এটি উৎসর্গ করেছিলেন কৈশোরবন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত[৩] (১৮৬৫-১৯১৫) কে। তিনি তখন যশোহর-খুলনার জেলা-জজ (জুন ১৮৯৮-মে ১৯০১)। *য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারির* মতো এই গ্রন্থের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। লোকেন্দ্রনাথের সাহচর্যের উত্তাপেই *ক্ষণিকা*র কবিতাগুলো লেখা হয়েছিলো বলে অনেকে মনে করেন। লোকেন্দ্রনাথ ওমর খৈয়মের[৪] চতুষ্পদী কবিতা রুবাই পাঠে আগ্রহী ছিলেন এবং এটি রবীন্দ্রনাথের মনোযোগও হয়তো পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ *ক্ষণিকা*র কবিতা লিখতে আরম্ভ করলে লোকেন্দ্রনাথ বিশেষ অনুরাগে সে খাতাটি নিজের কাছে নিয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ প্রেমতোষ বসুকে লিখেছেন,"লোকেন পালিত আমার "ক্ষণিকা"র সমস্ত কাপি এখান হইতে দস্যুবৃত্তি করিয়া কলিকাতায় লইয়া গেছেন" (প্রশান্তকুমার, ১৩৯৫ : ২৭৮)। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ৩ এপ্রিলে তিনি প্রেমতোষ বসুকে তাঁর প্রেসে কাব্যগ্রন্থটি ছাপানোর প্রসঙ্গে লিখলে, প্রেমতোষ এর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

'ক্ষণিকা'র উল্লেখে বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। তুমি এমন সুন্দর নামকরণ করিতে জান। তোমার অমর প্রতিভার অক্ষয় ভাণ্ডারে আর কতো অসংখ্য মণি-মাণিক্য আছে তাহা কোন বৈজ্ঞানিকও বলিতে পারে না-তুমিও পার না" (প্রশান্তকুমার, ২৬৮: ১৩৯৫)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যবন্ধু প্রিয়নাথ সেন (১৫ অগস্ট, ১৯০০) কে লিখিত একটি চিঠিতে *ক্ষণিকা* সম্পর্কে চন্দ্রনাথ বাবুর মন্তব্য কপি করে পাঠিয়েছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু[৫] লিখেছিলেন :

> তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই– তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ! তোমার প্রতিভার পরিমাপ নাই– উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। 'কণিকা', 'কথা', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা'–বলিতে গেলে চারি মাসের মধ্যে চারিখানা–পারিয়া উঠিব কেন?... যে চারিখানার নাম করিলাম সকলগুলিই মিষ্ট, হৃদয়স্পর্শী, সুগভীর, সুললিত, (অনেক স্থলে) সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ম। কিন্তু 'ক্ষণিকা'য় বঙ্গের পল্লীজীবনের পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি–পল্লীপ্রিয় পাড়াগেঁয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। এ সৌরভ তোমার আর কোন কাব্যে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বোধহয় এ সৌরভ শিলাইদহজনিত। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৯৩)

কবি ২০/২৩ টি কবিতায় ৩২ পেজি ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ ছাপাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও তা কোনো অজ্ঞাত কারণে মুদ্রণে দেরী হওয়ায় আরো কিছু কবিতা লেখা হয়। ৫ মে ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "–মহাকাল নিরবধি বটে কিন্তু মানুষের কারবার খণ্ডকাল লইয়া– "ক্ষণিকা" সম্বন্ধে সেটা আপনাকে বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে।...অতএব প্রসাধন কার্যের নেপথ্যবিধানে অতিরিক্ত কালাতিপাত না করিয়া ক্ষণিকাকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিয়া দিন। আমি অল্পে সন্তুষ্ট" (প্রশান্তকুমার, ১৩৯৫: ২৮১) ।

১৪ মে তে আরেকটি চিঠিতে লিখলেন, "সাজসজ্জা সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র চিন্তা ও বিলম্ব না করিয়া আপনি এইভাবেই ছাপাইয়া যান। দোহাই আপনার এবারে আর দেরী না – বৈশাখ গেল জ্যৈষ্ঠ আসিল– মনে আসা ছিল বসন্তে বাহির হইবে, গ্রীষ্মে হইলেও চলে কারণ তখনও দক্ষিণ বাতাস থাকে কিন্তু পুবে বাতাসের আমলে গিয়া যদি পড়ি তবে আষাঢ়ের ধারার সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য কবির মুষলধারে অশ্রুপতন হইবে" (প্রশান্তকুমার, ১৩৯৫ : ২৮২)।

ক্ষণিকা ছাপাতে গিয়ে মুদ্রণের এই দেরীর জন্য রবীন্দ্রনাথকে আরও কবিতা রচনার সুযোগ করে দিয়েছিল।

*ক্ষণিকা*র কবিতাগুলো ১৩০৬ সালের চৈত্রের শেষাশেষি থেকে ১৩০৭ সালের আষাঢ়ের প্রথমার্ধের মধ্যে রচিত হয়েছে। এর পূর্বে প্রকাশিত *কণিকা*য় কবি "বিশ্বসংসারের বিধি বিষয় ও বস্তুকে স্থানের যোগসূত্রে দেখিয়াছিলেন– তাহাকে কবিতাকণায় প্রকাশ করেন; আর *ক্ষণিকা*র কবি সেই বিশ্বকে কালের মধ্যে সহজভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া নূতন রীতিতে আত্মমোচন করিলেন" (প্রভাতকুমার, ১৩৯২ : ৪৯৮)। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের একটি অখণ্ড চিত্র ফুটে উঠেছে বলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন। তিনি আরো বলেন :

> তাঁহার অতীত জীবনের শুরু হইতে ভাবরাজ্যে যেসব স্তর পর পর অতিক্রম করিয়া তিনি আসিয়াছেন কবিতাগুলির মধ্যে সবেরই চিহ্ন যেন রহিয়া গিয়াছে। যৌবনের চঞ্চলতা ধীরে ধীরে গ্রন্থের মাঝখানে স্বচ্ছ সরোবরের শান্তি- সৌন্দর্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া আসিয়াছে। এই কবিতাগুলি প্রথমদিককার কবিতা হইতে গম্ভীর ও স্নিগ্ধ। গ্রন্থের শেষদিকে আসিয়া দেখি বিগত জীবনের অনেক শ্রান্তি অনেক ক্লান্তি অনেক মোহকে বিসর্জন দিতে উদ্যত" । (প্রভাতকুমার, ১৩৯২ : ৫০০)

'ক্ষণিকা'র প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলি বসন্ত ঋতুর ফসল, দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলো বর্ষার। 'সঞ্চয়িতা'র নির্বাচিত কবিতায় *ক্ষণিকা*র কুড়িটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর দশটি বসন্তের এবং দশটি বর্ষার । বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের (১৩৬৯) মতে, সৌন্দর্য সাধনা এবং মাধুর্য সাধনার ইতিহাস *ক্ষণিকা* লিরিক। এর সব কটি কবিতা মিলে সৃষ্টি হয়েছে একটি ভাবসুরভীত কবিত্বমণ্ডল। *ক্ষণিকা*য়

মোটামুটি দুটি ভাগ আছে। প্রথম থেকে 'কবির বয়স' পর্যন্ত প্রথম ভাগ, 'বিদায়' হইতে দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে কবি মনের সাথে বোঝাপড়া করে, সাংসারিক কাজকর্ম পরিত্যাগ করে যেতে চেয়েছেন আনন্দলোকে। প্রকৃতির সঙ্গে সৌন্দর্যের সঙ্গে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে কবি সৌন্দর্যের সঙ্গে মাতাল হয়ে আনন্দবিশ্রামে চলেছেন।

৪.

*ক্ষণিকা*র প্রথম ভাগে কবি মনঃপ্রজ্ঞার অনুভবে সময়কে ইতিবাচকভাবে উপভোগ করেছেন। পরিবর্তনে বিশ্বাসী মনই জীবনকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারে। জীবনটাই ক্ষণিকের। জীবনযাপনের মান-অভিমান, বিষণ্ণতা, রাগ অনুরাগ ভুলে এগিয়ে যাওয়ার কথা নিয়ে রচিত হয়েছে এর প্রথম কবিতা *উদ্‌বোধন*। একে 'সমগ্র কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ' মনে করে সৈয়দ আলী আহ্‌সান বলেছেন, "এই পৃথিবীতে চলছে ক্ষণকালীন সুখের উৎসব। সেই উৎসবে কবি যোগ দিতে চাচ্ছেন। তরঙ্গিত নদীর হিল্লোলে আলোর যেমন কম্পন, তেমনি উচ্ছলিত চাঞ্চল্যে পৃথিবীর জীবন-যাপন করতে হবে। এভাবে অকারণ পুলকে জীবন-যাপন করাকে কবির কাছে মধুর মনে হয়েছে" (সৈয়দ, ২০১৪ : ১১৯)। রবীন্দ্রনাথ তাই আনন্দের পতাকা উড়িয়ে উদ্বোধনী সঙ্গীত শুনিয়ে গেয়ে যান :

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে। (উদ্‌বোধন, *ক্ষণিকা*)

এই পৃথিবীতে স্থান পেয়ে, এই পৃথিবীর প্রাণগতির অংশ হতে পেরে কবি পুলকিত। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> আমি সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র এবং মাটি পাথর জল সমস্তের সঙ্গে একসঙ্গে আছি এই কথাটা এক একটা মুহূর্তে যখন আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট সুরে বাজে তখন একটা বিপুল অস্তিত্বের নিবিড় হতে আমার দেহ-মন পুলকিত হইয়া উঠে। ইহা আমার কবিত্ব নহে ইহা আমার স্বভাব। (বিজন, ২০১৩:২৯০)

ক্ষণিকার দ্বিতীয় ভাগে কবি মনঃপ্রজ্ঞা অনুভবে উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করেছেন। তিনি সমাহিত হৃদয়ে বিশ্রামের অবসর খুঁজছেন। রূপকের মাধ্যমে তিনি জানাচ্ছেন, সন্ধ্যার নৌকা তৈরি হয়েছে, সে নৌকা আঁধার করে রেখে তিনি ধ্যানী অনুভবে সময় পার করবেন। মনের এই স্থির অনুভবেই তিনি বৃহৎ এর পথে এগিয়ে যাবেন।

জানাজানির সময় গেছে
বোঝাপড়া কর্‌ রে বন্ধ
অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে
থাক রে হয়ে বধির অন্ধ। (শেষ হিসাব, *ক্ষণিকা*)

ক্ষণিকার উপভোগ এবং উপলব্ধির এই দুই অনুভবের সেতু হিসেবে কাজ করেছে মাইন্ডফুলনেস বা মনঃপ্রজ্ঞা।

৫.

কোনকিছুতে ভিন্নভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সাথে মনোযোগ দেয়া হলো মাইন্ডফুলনেস বা মনঃপ্রজ্ঞা। মুহূর্তকে অনুভব করার এ যেন এক অধিবিদ্যাগত দৃষ্টিভঙ্গি। মনোবিজ্ঞানীরা স্বাস্থ্য ও সুখের অনুসন্ধানে মাইন্ডফুলনেস নামের বিস্ময়কর এই বিজ্ঞানচিন্তার অবতারণা করেছেন। মনঃপ্রজ্ঞার অনুভবে মস্তিষ্কের ডান ও বাম দুই অংশই ভারসাম্য রেখে যৌক্তিকভাবে কাজ করতে পারে। জ্ঞান, দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেরাটাকেই বেছে নিতে পারে। আমাদের উদ্বেগ, হতাশা, রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয়। মাইন্ডফুলনেস আমাকে এই মুহূর্তেই সচেতনভাবে থাকতে শেখায়। লক্ষ লক্ষ ঘুরপাক খাওয়া চিন্তায় গঠিত মাথা আমাদের প্রতি মুহূর্তে বাঁচতে দেয় না। মনঃপ্রজ্ঞা প্রতি মুহূর্তকে সম্পূর্ণভাবে পেতে সাহায্য করে। মনের একাগ্রতা বাড়ায়, হতাশা অস্থিরতা দূর করে প্রশান্তি নিয়ে আসে।

দৈহিক, মানসিক, শারীরিক– জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যা কাজে লাগে। আমাদের শান্তি সুখের সন্ধান এনে দেয়। সকল ব্যস্ততার সময়েও শান্তির অবসর খোঁজা মন, মনঃপ্রজ্ঞার ফলে সময়কে অর্থপূর্ণ ও সুন্দর করে তুলতে পারে। যে কোন সংকটে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আমাদের ভেতর ও বাইরের জীবন সুসামঞ্জস্যময়, গতিশীল ও ছন্দময় হয়ে ওঠে। আমরা দৈহিক ও মানসিকভাবে স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠি।

দেখার, শোনার, বোঝার, ভাবার ও করার ইন্দ্রিয়জ সংযুক্তি আরো গভীর মাত্রা পায়। মনঃপ্রজ্ঞা এই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়াশীল (Reactive) না হয়ে, ইতিবাচকভাবে ক্রিয়াশীল (Responsive) থাকতে শেখায়। মনঃপ্রজ্ঞার বিরতি (pause) এক একটি ধ্যানের মতো, যা মুহূর্তে নিয়োজিত করে। এটি অস্তিত্ববাদের মতো আশাবাদী ও সক্রিয় মতবাদে বিশ্বাসী। আমাদের কার্যক্ষমতা ইতিবাচক, সহনশীল ও সক্রিয় হয়। হতাশা ও দুশ্চিন্তা কাটিয়ে কৃতজ্ঞতাবোধে আমরা বৃহতের পথ চিনে নিতে পারি। যেমন যখন আমরা এক কাপ চা পান করি, তখন সেই সময়ে থেকে সে চায়ের স্বাদ, গন্ধ, পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে তৃপ্তি পাই, এরপর সংযোগের বোধে কৃতজ্ঞ হই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ৬৩ বছর বয়সে লেখা, *গীতবিতানের* প্রকৃতি পর্যায়ের ৮ সংখ্যক গানে চমৎকারভাবে মনঃপ্রজ্ঞার একটি ভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন :

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,

বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
অসীম কালের যে হিল্লোলে জোয়ার-ভাঁটায় ভুবন দোলে
নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বনের পথে যেতে,
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে,
ছড়িয়ে আছে আনন্দেরই দান,
কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি,
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের অনন্য উপহারস্বরূপ বলে মনে করেন। একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়ে' বলেছেন:

> ... এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে– এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছিনে! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোকভুলোকের মাঝখানের সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য– এর জন্যে কি কম অয়োজনটা চলছে! কতোবড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এতবড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে সাড়াই পাওয়া যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না! মনটা যেন আরো শতলক্ষ যোজন দূরে! (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১: ৩৪)

জীবনকে রবীন্দ্রনাথ আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেছেন প্রতি মুহূর্তে। আনন্দের এ উৎস মনেই থাকে। মনঃপ্রজ্ঞা সচেতন মনই পারে নিবিড় সাধনা দিয়ে, নেতিবাচক দিক সরিয়ে, ইতিবাচক ও স্বাস্থ্যকর হাওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে। পরম বিস্ময়ে হৃদয়ে সুরের ধারা জাগাতে।

৫.১

'এই মুহূর্তের জন্য সুখী হও, এটাই তোমার জীবন'-ওমর খৈয়ম

*ক্ষণিকা*র দর্শন সহজিয়া জীবন দর্শন। জীবনের ভালো-মন্দ, ওঠা-নামা, সকল পরিবর্তন সহজে গ্রহণ করে মনোপূর্ণ হৃদয়ে প্রফুল্ল থাকার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান

উদযাপনই এর মূল লক্ষ্য। "বর্তমানের শক্তি অনেক। প্রতি মুহূর্তেই আমরা সেই শক্তিকে পার হয়ে যাই" (ফারুক, ২০১৩ : ১১)। 'আনন্দরস উপভোগের ক্ষেত্রে বর্তমানকে প্রাধান্য দেয়াই 'ক্ষণিকা' কাব্যের মূল প্রতিপাদ্য' (আবু, ২০১৫: ১০৯)। এই বর্তমান উদযাপনের কথা আমরা *ক্ষণিকা*র যেসব কবিতাগুচ্ছে পাই সেগুলো হলোঃ 'উদ্‌বোধন', 'যথাসময়', 'মাতাল', 'যুগল', 'শাস্ত্র', 'অনবসর', 'অতিবাদ', 'বোঝাপড়া', 'সেকাল', 'প্রতিজ্ঞা', 'পথে', 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ', 'সোজাসুজি', 'অসাবধান', 'যাত্রী', 'ক্ষণেক দেখা', 'কৃষ্ণকলি' প্রভৃতি ।

জীবনের ও আনন্দের কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না সব অভিজ্ঞতাকেই গ্রহণ করেছেন হৃদয়ে। 'রবীন্দ্রনাথের জীবনের মূল সূত্র ছিল নৈর্ব্যক্তিকভাবে সমস্তকে স্পর্শ করা' (প্রভাতকুমার, ১৩৯২ : ৪৯৬)। জীবনের যত অভিজ্ঞতা আছে, সেসব সহ আরো যতো ঘটনা ঘটে চলেছে সেগুলোকে তিনি নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে দেখে সকলকে বর্তমান জীবন উপভোগ ও উদযাপনের আহ্বান জানান। অমিতা ঠাকুরকে (১৯১১-১৯৯৯) লেখা (নভেম্বর, ১৯২৯) একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন :

> তোর চিঠি থেকে আমার মনে পড়ল *ক্ষণিকা*র প্রথম কবিতাটি। অর্থ্যাৎ জীবনটাকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া। ঘটনায়, ভাবনার বাসনার প্রবাহ চলছে– সেই চলমান স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতেই জীবনটা তৈরি হয়ে উঠচে, এক মুহূর্তের সঙ্গে আর এক মহূর্তের সমন্বয়সূত্রে– যেটুকু যতক্ষণ পর্যন্ত হাতে এসে ঠেকে তার চেয়ে বেশি দাবি করলেই তাল কেটে যায়। (বিজন, ২০১৩ : ৩৪)

এই সত্যকে মনে রেখে *ক্ষণিকা* র প্রথম কবিতা *উদ্‌বোধন*-এ কবি বলেছেন :

> যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
> আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
> আজিকার মতো যাক যাক চুকে
> যত অসাধ্য-সাধনি।
> ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
> ওরে থাক্ থাক্ কাঁদনি! (উদবোধন, *ক্ষণিকা*)

যখন যেখানে যার সঙ্গে থাকি সে সময়েই সম্পূর্ণভাবে থাকাটাই স্বাস্থ্যকর। ক্ষুদ্র এই মানবজীবন, ক্ষুদ্র শিরীষফুলে লেগে থাকা শিশিরবিন্দুর মতো ঝলোমলো করে রাখার আহ্বান জানান রবীন্দ্রনাথ। সন্‌জিদা খাতুনের মতেঃ

> ফুলের মতো সহজ বিকাশ আর আর স্বাভাবিক ঝরা-খসা মানবজীবনের আদর্শ হলে জীবন আনন্দময়, গতিশীল এবং সুবহ হয়, এমন কথা 'ক্ষণিকা'তে যেমন, গানেও বলেছেন নানা ভাবে। সে-গান প্রকৃতির ভিতরে সকল বন্ধন ছিন্ন করে অহরহ ছুটে চলবার, 'ফেলে দেবার, ছেড়ে দেবার, মরবার' আনন্দের যে ছন্দ তাতে মিলতে চান কবি। (সন্‌জিদা, ২০১১ : ১৪)

যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে–
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে। (উদ্‌বোধন, *ক্ষণিকা*)

সহজিয়া জীবন দর্শনের এই একই মনোভাব আরো সহজে এসেছে 'বোঝাপড়া' কবিতাতেও :

মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে। (বোঝাপড়া, *ক্ষণিকা*)

প্রবাদবাক্যের মতই এ পঙ্‌ক্তি বিরাজমান।

"জীবনের সকল সত্য অবস্থাকে মেনে নেয়াই জীবন-সাফল্যের স্বীকৃত পথ" (আবু, ২০১৫ : ১০৪)।

ব্যথার মেঘে ঝুলে থাকলে তাতে জীবনের আরো যত ছোট বড় দুঃখ আছে, তা এসে ভিড় করে। রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে (২২ জুলাই, ১৯০৯) একবার লিখেছিলেন :

> নিজেকে দুঃখী বলিয়া চিন্তা করিতে থাকিলে দুঃখের কালিমা বাড়িয়াই উঠে। আমরা চিন্তা দ্বারা নিজেকে অনেক পরিমাণে সৃষ্টি করিয়া থাকি– আমাদের সেই স্বরচিত সৃষ্টি সকল সময়ে মঙ্গলকর হয় না। নিজের সুখ দুঃখ ও অবস্থার প্রতি সর্বদাই করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যজনক। উহাতে নিজেকে প্রশ্রয় দিয়া কেবলি দুর্বল করিয়া তোলাই হয়। নিজেকে ভুলিবার সাধনাই জীবনের প্রধান সাধনা– এবং আমার যেটুকু নাই তাহার চেয়ে আমার যাহা আছে তাহা যে অনেক বেশি এই কথা স্বীকার করিতে পারাই সত্যকে স্বীকার করা। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ২১০)

সত্য অর্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথ মনের সাথে বোঝাপড়া করে নেন। সংসারে অতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তা না করে, বৃথা ঝগড়াঝাটি না করে পাখির মতো ভেসে থাকতে পারলেই সুখ।

'পৃথিবীতে যা সহজে নিশ্চিন্তে একজনের কাছে আসে তাকেই গ্রহণ করা ভালো। যা সহজে আসে না তার জন্য মর্মাহত হয়ে কোন লাভ নেই।...বিধাতার সঙ্গে বিবাদ করে তো লাভ নেই' (সৈয়দ, ২০১৪ : ১২৩)। ক্ষণবাদী পারসি কবি ওমর খৈয়ম (১০৪৮-১১৩১) এর একটি রুবাইতে আছে :

আজ আছে তোর হাতের কাছে, আগামী কাল হাতের বার,
কালের কথা হিসাব করে বাড়াসনে তুই দুঃখ আর

স্বর্গ-ক্ষরা ক্ষণিক জীবন– করিসনে তার অপব্যয়,
বিশ্বাস কি– নিঃশ্বাস-ভর জীবন যে কাল পাবি ধার। (রুবাই ৮১ : কাজী, ২০০৭ : ১৬৮)

তিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকে ভুলে আজকের জামসেদিয়া জামবাটির বা প্রেমের পেয়ালাপূর্ণ মধু লুট করে নিতে বলেছেন। হোক সে তিক্ত বা মধুর, কারণ সময় চলে যাচ্ছে। "কাল কি হবে কেউ জানে না দেখছ ত হায় বন্ধু মোর/ নগদ মধু লুঠ করে লও, মোছ মোছ অশ্রু লোর" (রুবাই : ৩৩ কাজী, ২০০৭ : ১৬০)।

রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষণিক জীবনের ছোট আয়ুর মাপের পেয়ালায় প্রতিদিনের রসপানে' ব্যস্ত থেকেছেন। অতীত ও ভবিষ্যৎ দুটোই খামখেয়ালী, তাই এই মুহূর্তেই খেয়ালী হয়ে নগদ জীবন যাপন করার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

সহজ জীবন, সহজ বেশ, সহজ আনন্দ পাওয়ার কথা নিয়ে অনন্যসাধারণ কবিতা *চিরায়মানা*। "যেমন আছ তেমনি এসো"– এই মনোভাবে তিনি কাছের মানুষটিকে বলে যান,

এসো হেসে সহজ বেশে
আর করো না সাজ।
গাঁথা যদি না হয় মালা
ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,
ভূষণ যদি না হয় সারা
ভূষণে নাই কাজ। (চিরায়মানা, *ক্ষণিকা*)

রবীন্দ্রনাথের মতে, "সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়– সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়" (বিজন, ২০১৩ : ১৯৫)। এমনি সহজ সাজে সজ্জিত, গ্রামের প্রান্তরের একটি মেয়েকে কবি তাই 'কৃষ্ণকলি' নামে ডাকেন। অসাধারণ এই কবিতায় প্রকৃতির সরলতার মতো স্বাভাবিক ও সচল মেয়ের কালো হরিণ চোখে কবি সৌন্দর্যের আলো দেখতে পেয়েছেন। সবাই তাকে কালো বললেও কবির তাতে কিছুই এসে যায় না। তিনি যে আলোর সৌন্দর্যে মুগ্ধ। গীতমুখরতায় তাই তাঁর কণ্ঠে জাগে :

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ–চোখ। (কৃষ্ণকলি, *ক্ষণিকা*)

সোজাসুজি কবিতায় 'যুগল' কবিতার মতোই নরনারীর প্রেমকে জটিলতাহীন সাম্প্রতিক বিষয় বলে জানিয়েছেন।

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজি নে ভাই, ভাষাতীত,
আকাশ-পানে বাহু তলে
চাহি নে, ভাই, আশাতীত।

... ...

আমাদের এই দোঁহার মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি। (সোজাসুজি, *ক্ষণিকা*)

প্রেমের কুঞ্জে অনেক বাঁকা গলি, অনেক তৃষ্ণা, অনেক বাঁধা থাকলেও দুটি প্রাণের হৃদয়ের কাহিনিটা প্রকৃতির মতোই খুবই সোজাসুজি। এর মাঝে রহস্য খোঁজার প্রয়াসী তিনি নন।

প্রসারিত ও বিস্তৃত জীবনযাত্রার খোঁজে আনন্দের উপকরণ খুঁজে জীবনকে উদযাপনের কথা বলেন *বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ* কবিতায়।

দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই–
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই–
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাব তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশমনে
রইব না আর কভু।
যাবই আমি যাবই, ওগো,
বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই, তবু
আর কারে তো পাবই। (বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, *ক্ষণিকা*)

'এই কবিতায় বাণিজ্যযাত্রার রূপকে কবি জীবনকে উন্মোচিত করার তাগিদ দিয়েছেন। প্রসারিত হওয়া জীবনের অনিবার্য শর্ত' (সরকার, ২০১৫ : ৫৩)। এখানে সেই যাত্রী রবীন্দ্রনাথের উপনিষদের চলার মন্ত্র 'চরৈবেতি' বা 'আগে চল্ ভাই' মনোভাবের জয় ঘোষিত হয়েছে। "রবীন্দ্রনাথ জীবনে চলার পথে কোথাও থেমে পড়েন নি। কোনো নতুন সমস্যায় যেমনি তিনি উদ্বিগ্ন হন, তার নতুনতর সমাধানেও তেমনি তিনি নিরস্ত হন না" (মনিরুজ্জামান, ২০১১ : ৫৩)। মন ও সময়ে জাগ্রত থেকে, প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামী সময়কে তিনি সচেতনভাবে অতিবাহিত করেছেন।

৫.২

সময় এক অনন্ত প্রবাহ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন সীমায় আবদ্ধ সময়, এই রহস্যময় মানবজীবনের এক বাস্তব রহস্য। যে সময়ে যা-তাই নিয়েই সন্তুষ্টচিত্ত

থাকতে হয়। সময়ের ছন্দে বাঁধা এই জীবন, মনঃপ্রজ্ঞা অনুভবেই সুবহ ও সরল করে তোলা যায়। সময় বা কাল সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অভিমত হলো প্রায় পনেরো বিলিয়ন বছর আগে, "বৃহৎ বিস্ফোরণের সময় (big bang) কালের শুরু" (স্টিফেন, ২০১৬ : ২৮)। বিজ্ঞানীরা সময়ের তিনটি[৬] তীরের কথাও উল্লেখ করেন। এগুলো হলো, তাপগতীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক তীর। আমরা সহজভাবে সময়কে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনভাবে বর্ণনা করি। তিনটি কালের মধ্যে বর্তমানটাই সহজ ও প্রত্যক্ষ সত্য, অন্য দুটি কাল বর্তমানের ছায়া দিয়েই কল্পনায় জায়গা করে নিতে হয়। "বর্তমান খরস্রোতা নদীর মতো সদা দ্রুত বহমান, এই মুহূর্তে যা বর্তমান থাকে, পর মুহূর্তে তা অতীতে রূপ নেয়; মহাকালের পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত পথসীমায় বিলীন হয়ে যায়। আর 'ভবিষ্যৎ' সম্ভ্যাব্য প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির এক অনিশ্চয়তায় ও উৎকণ্ঠাময় অগ্নি-সময়ে জীবনকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। অনাগত এ কাল কুহকের মতো জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, বর্তমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অথচ জীবনদ্বারে তার আগমন নাও ঘটতে পারে" (আবু, ২০১৫ : ১০২)।

অন্যদিকে বর্তমান সময়টাই শুভ সময় ও দুঃসময় এই দুই রূপে মনের আঙিনায় ধরা দেয়। শুভ সময় যেন ব্যস্ত পায়ে পারদের মতোই সরে সরে যায়, আর দুঃসময় মাথার প'রে কালো মেঘের পাল তুলে ধীর গতিতে অগ্রসর হয়।

> 'সময়ই নির্ধারণ করে দেয় স্বজন– দুর্জন
> না চাইলেও মানতে বাধ্য সময়ের প্রয়োজন।' (শামসুল, ২০১৮ : ৮১)

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে *ক্ষণিকা*য় সময় ও মানবমনের পারস্পরিক সম্পর্কের কাব্যরূপ উপস্থাপন করেছেন। *ক্ষণিকা*র 'যথাসময়' নামের একটি কবিতা 'যে সময়ে যা' সে অনুভবেরই প্রকাশ।

> ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে
> বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে,
> ... ...
> বন্ধু জনে বন্ধ করে প্রাণ,
> দীর্ঘ দিন সঙ্গীহীন একা,
> তখন ঘরে বন্ধ হ রে কবি,
> খিলের পরে খিল লাগাও খিল। (যথাসময়, *ক্ষণিকা*)

যখন বন্ধুভাগ্য কৃপণতা করে,তখন সে নিঃসঙ্গতার সময় তিনি কথার মালায় কবিতা সাজাতে অনুপ্রেরণা দেন। কিন্তু শরৎ এর হঠাৎ বৃষ্টির মতো হঠাৎ জাগরণে বন্ধুভাগ্য ফিরে যদি আসে, তবে হৃদয়ে হৃদয় বেধে, হাতে হাত ধরে, চোখে চোখ রেখে কবিতার ধ্যান ছেড়ে আনন্দগান গাইতে বলেন।

যুগল কবিতায় একটি বেলা তিনি প্রেমিক যুগলের জন্য উৎসর্গ করেন। যারা শুধুমাত্র একবেলার জন্য প্রেমের মধুর ভুবনে স্বর্গীয় আমেজে সময় কাটাবে। "আজকে শুধু একবেলারই তরে / আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।"

কবির মনে লেগেছে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া। সে হাওয়ায় বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা সব ঝেড়ে-ঝুড়ে ভেসে বেড়াতে চান। *মাতাল* কবিতায় তিনি বলেনঃ

সংসারেতে সংসারী তো ঢের,
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
মেলাই আছে মস্তবড়ো লোক–
সঙ্গে তাদের অনেক সেজো মেজো.
থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে–
লাগুক মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া! (মাতাল, *ক্ষণিকা*)

মাতাল যেমন নিজের মনের আনন্দে বিনা কাজেই সময়ে মেতে থাকে, তেমনি তিনি দিক বিদিকে ছুটে আনন্দ খুঁজবেন। সঞ্চয়ের কোনো নেশায় আবদ্ধ থাকবেন না। এই কবিতায় সংসারের "অহংকারসর্বস্ব বিদ্বান আর মুখোশপরিহিত ভদ্রলোকের ওপর অনেক চটে বেশি গিয়ে একটি কাব্যিক বিবৃতি ঘোষণা করেছেন" (সরকার, ২০১১ : ১১৮)।

"*ক্ষণিকা* পলায়নপর বর্তমান মুহূর্তের কাব্য। অতীত ও ভবিষ্যৎ এখানে কবি-চিন্তার বাইরে" (প্রমথনাথ, ১৩৬৩ : ১৩৭)। এই বর্তমানটাই সত্য[৭] বলে বিশেষ সান্ত্বনা পাবার অবকাশ আছে। *সেকাল* কবিতায় কবি সে কথাই বুঝিয়েছেন, অতীতকে কখনো কখনো চির মনোরম মনে হলেও সেখানে পৌঁছানো যাবেনা। মানুষের জীবনে এমনি একটা পিছন টান থাকে বলেই কবি এমনি একটি মনোগ্রাহী কবিতা লিখেছেন।

আপাতত এই আনন্দে
গর্বে বেড়াই নেচে–
কালিদাস তো নামেই আছেন,
আমি আছি বেঁচে। (সেকাল, *ক্ষণিকা*)

রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ও বর্তমানের বাস্তবতা সম্পর্কে *নষ্ট স্বপ্ন* কবিতায় জানিয়েছেন, 'হায় রে, সত্য কঠিন ভারী/ ইচ্ছামত গড়তে নারি–" তাই বৃথা মিথ্যা ও মধুর স্বপ্ন দেখে লাভ নেই।

জীবনে ঠিক সময়ে ঠিক কাজ না করতে পারার বেদনার কথা প্রকাশ পেয়েছে *একটিমাত্র* কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ প্রতীকের সাহায্যে আমাদের জানাচ্ছেন, একটিমাত্র ক্ষণ কখনো কখনো দুর্লভ মিষ্টি আঙুর ফলের মতোই সম্ভাবনায় হয়ে হাতে ধরা দেয়, কিন্তু তাকে যথাযথ গ্রহণ ও অবহেলার অভাবে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

বনের মধ্যে পেয়েছিলেম
একটি আঙুর ফল।
… … … … … …
বেলা যখন পড়ে এল,
রৌদ্র হল রাঙা,
… … … … … …
তখন খুলে দেখনু চেয়ে
চক্ষে লয়ে জল
মুঠির মাঝে শুকিয়ে আছে
একটি আঙুর ফল। (একটিমাত্র, *ক্ষণিকা*)

সময়ের সাথে মাইন্ডফুল না থাকলে, সময় সোনার বলগা হরিণের মতোই ছুটে ছুটে পালায়। এ কারণেই আমরা মাঝে মাঝে অগোছালো ও পেছানো জীবন যাপন করি। *অকালে* কবিতায় সন্ধ্যারূপের অপরূপ বর্ণনায় তেমনি একজন পথিকের অকালে পসরা নিয়ে ভাঙা হাটে ছোটার দৃশ্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

সকল চেষ্টা শান্ত যখন
এমন সময়ে
ভাঙা হাটে কে ছুটেছিস
পসরা লয়ে। (অকালে, *ক্ষণিকা*)

ক্ষণিকার পূর্ববর্তী *কল্পনা* (১৯০০) কাব্যে আমরা *ভ্রষ্ট লগ্ন* নামে একটি কবিতায় মনোজ্ঞ রূপকে, মনঃপ্রজ্ঞা না থাকা সময়ের পরিহাসকে লক্ষ্য করেছি। সময় যেন সেই প্রেমিক, যার হাত ঠিক ঠিক সময়েই ধরতে হয়, নইলে ব্যর্থ প্রেমিকার মতো জীবনে আলোর আনন্দ, অন্ধকারের বিষাদে রূপ নেয়।

"হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি" সিদ্ধান্তহীনতার এমনি গানে বেদনাবিধুর সময় কাটাতে হয়। মাইন্ডফুলনেস বা মনঃপ্রজ্ঞা একইসাথে উপভোগ ও উপলব্ধিজাত।

৫.৩

দেখা যায়না, ধরা যায়না কম্পিউটারের সফট্ওয়্যারের মতো এমনই এক বিষয় মন। মন নিয়েই মানুষের যত কারবার। মানুষ এই মনেরই অধীন হলেও মনের মালিক সে নয়।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মন সম্পর্কে জানাচ্ছেন:

মন কি কেহ চিনিস?
আছে কারও আপন হাতে
মন ব'লে এক জিনিস ?

চলেন তিনি গোপন চালে,
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে–
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্ছে! (অচেনা, *ক্ষণিকা*)

"মন, মন করে মানুষ এই নশ্বর ক্ষণকালীন জীবনকে বিষিয়ে তুলছে। অদৃশ্য এবং ধারণাগত এই অনুষঙ্গটি পাওয়ার জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে ছুটছে, জীবনে সুখের অনুষঙ্গগুলোকে নস্যাৎ করছে, নিজ জীবনকে পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছে" (আবু, ২০১৫: ১০৫)।

সময়ের মতোই মনও নিজের নিয়মে চলে । *অসাবধান* কবিতায় কবি সরসে ও সকৌতুকে বলে যান :

আমায় যদি মনটি দেবে
দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।
খোলা আমার দুয়ারখানা,
ভোলা আমার প্রাণ,
কখন যে কার আনাগোনা–
নইকো সাবধান। (অসাবধান, *ক্ষণিকা*)

এজন্য কবি নিজে অসাবধান থাকলেও প্রেয়সীকে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, মনের বদলে মন না পেলে সে যেন দুঃখ না পায়, কারণ মনের মালিক যে তিনি নিজে নন। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন :

> জীবনে বারো আনা দুঃখের মূলে ভুল-বোঝা; আবার বারো আনা ভুল বোঝার মূলে মনের ভুল পরিচয়। এই মন পদার্থটা মনুবংশীয়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কিন্তু এটা আবার তাহার শ্রেষ্ঠ বিপদেরও হেতু বটে।... বহুযুগ একত্র বাস করিলেও মন ও দেহে সম্পূর্ণরূপে বোঝাপড়া হয় নাই, একে অন্যের ভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। (প্রমথনাথ, ১৩৬৩ : ১৫৩)

"মন এমনই এক বিষয়, "সে যখন জলে থাকে তখন স্থলের জন্যে লালায়িত হয়, যখন স্থলে থাকে তখন জলে সাঁতার দেবার জন্য তার অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়" (বিজন, ২০১৩, ১৪৬)।

চেতনাগত উপলব্ধির এই মনের অবস্থার ওপরেই সময়ের বাঁক নির্ধারিত হয়। মন যেন সেই বৈঠা যা নিজেকেই বয়ে নিয়ে যেতে হয়। সময় – যা এই মুহূর্তেই আমার দখলে, এই সময়ের চাবিকে ঠিকমতো পরিচালনার ওপরেই মনের তালাকে বশে আনা

যায়। এই সময়ের চাবিটিকে যদি অবহেলা কিংবা ভারাক্রান্ত অনুভবে নিজের অধিকারে না রাখি, তবে তা মহাকালের গহ্বরেই চিরকালের মতো হারিয়ে যায়। তখন অনন্ত সময়ের যিনি মালিক, যিনি প্রতি মুহূর্তের সোনার চাবির অধিকার মানুষকে দেন, তাঁর সঙ্গে সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একাত্মতার বোধ না থাকলে এই সংযোগ অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই কবি স্মিতহাস্যের আকাশের মতোই সময়বোধে নিমগ্ন থাকার কথা বলেছেন। এজন্য প্রয়োজন শিশুর সারল্যের ও বিস্মিত হওয়ার মতো দৃষ্টি। শিশুমন সব সময়ই বর্তমানে থাকে। সামান্য কোনো খেলনাকে সে নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করে বলেই খেলনাটি তার কাছে সত্য ও সুন্দর হয়ে ওঠে। সে আনন্দ পায়। সংসারে আমরা প্রতিনিয়ত যে কাজের সম্মুখীন হই সেটা যদি শুধু নিজেরই কাজ ভাবি (পরের বা চাপে পড়া কাজ না ভেবে) তবে আনন্দকে উপলব্ধি করতে পারি। মাইন্ডফুল বা মনঃপ্রজ্ঞার অনুভবেই মুহূর্তকে উপভোগ করা যায়।

৫.৪

মনঃপ্রজ্ঞা হৃদয় প্রকৃতি সচেতন। *ক্ষণিকা* প্রকৃতিপ্রাণে মুহূর্তের সৌন্দর্য ও আনন্দ খুঁজে নেবার কথা বলে। প্রকৃতি এক বিশল্যকরণী সত্তা । রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি-প্রাণে, সজীব থাকার কথা বলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও *তৃণাঙ্কুর* উপন্যাসে জানিয়েছিলেন, "মৃত, মূর্চ্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই" (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৪ : ১৫৩)। এই পৃথিবীতে মানুষের মনকে জাগাতে, শক্তিময় প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে দৃশ্যপরিবর্তন করছে। প্রকৃতি-প্রাণ না থেকে আমরা তবু মোহময়তায় মৃত জীবন যাপন করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছেন :

> আমরা একটু নিবিষ্টচিত্ত স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে তর্জমা করে নিতে পারি। জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম কম্পন ধ্বনিকে কেবল চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। (বিজন, ২০১৩ : ৬৬)

তিনি নিজেও প্রকৃতি থেকেই প্রাণরস পেয়েছেন। রবীন্দ্র অনুভব জানায়, "এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতি ক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে, আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি" (বিজন, ২০১৩ : ১২২)। *আত্মপরিচয়ে* তিনি এভাবে বলেছেন :

> সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোটো শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশদূতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেকবারি নিয়ে যোগ দিতে কোনদিন আলস্য করিনি। প্রতিদিন ঊষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ৬৩)

কবি তাঁদের জন্য বিস্মিত হন যারা নিজের চারপাশে দেয়াল ঘিরে রেখেছে। আর একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন :

> যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো বড় অদ্ভুত জীব, এরা কেবলই দিন রাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এইজন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারী অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখেনি, চাঁদের নিচে চাঁদোয়া খাটায়নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা অন্ধগুলো বদ্ধ পালকির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে। ...যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সুত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে। কিন্তু, এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে, সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না। (বিজন, ২০১৩ : ১১৯)

প্রকৃতি আমাদের নিত্যকাল থেকে ডেকে চলেছে। প্রকৃতিতে ফুটে চলেছে ফুল, ডেকে উঠছে পাখি, নদীজলে ঝলকে উঠছে আলো, সে আনন্দযজ্ঞে ক্ষণিক দৃষ্টি দিয়ে, সে ঘ্রাণ নিয়ে, তাদেরই গান গাইতে বলেছেন সকলকে।

প্রকৃতি চির যৌবনে চঞ্চল কিংবা যৌবনেই প্রকৃতির নতুন পাতার মতোই বিস্ময়ের চোখ থাকে। চির যৌবনের কবি তাই তাঁর বয়স সম্পর্কে 'কবির বয়স' কবিতায় বলতে পারেন, তিনি "পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো" সবার তিনি 'এক বয়সি'। যৌবনের মন বিচারশীল নয়, চিরাচরিতের লৌহশৃঙ্খল যুগে যুগে তারা ভেঙ্গেছে, যৌবনই সগর্বে বলতে পারে–

> চিত্তদূয়ার মুক্ত রেখে
> সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
> আজকে আমি কোনমতেই
> বলব নাকো সত্য কথা। (অতিবাদ, *ক্ষণিকা*)

'শাস্ত্র' কবিতায় কবি শাস্ত্রনির্দেশিত পথ ও পন্থাকে বাতিল করেছেন। শাস্ত্রকারের কাছে বন হচ্ছে বৈরাগ্য, যেখানে জীবনের তৃতীয় ও শেষ আশ্রম। প্রৌঢ় বয়সে অর্থাৎ পঞ্চাশের পরে সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে বসবাস এবং ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থেকে অবশিষ্ট জীবন যাপনই হলো বানপ্রস্থ বা বনে সন্ন্যাসজীবন যাপন। এই তৃতীয় আশ্রমের বয়স পঞ্চাশে না হয়ে যৌবনেই ভালো বলে কবি অভিমত দিয়েছেন। কারণ একজন বৃদ্ধ যদি বানপ্রস্থে যায় তবে সে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে, মধুরিমাকে উপভোগ করতে পারে না। সৌন্দর্যভোগ তো যৌবনেরই ধর্ম।

কবির কাছে বন যৌবনের উৎসাহরস পাবার কেন্দ্র। তাই কবি আহ্বান জানান :

ফাগুন-মাসে লগ্ন দেখে
যুবারা যাক বনের পথে,

রাত্রি জেগে কাব্যসাধন,
থাকুক রত কঠিন ব্রতে। (শাস্ত্র, *ক্ষণিকা*)

'অনবসর' কবিতায় প্রকৃতির মতোই চির আধুনিক থাকার দৃষ্টিভঙ্গী ঘোষিত হয়েছে। কবি এখানেও শাস্ত্রবিরোধী, যে নিয়ম, আচার ও দর্শন বলে 'জীবন শুধু পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দু' – সে জীবনের পিছে সময় ও শ্রম দিয়ে লাভ নেই, তিনি তাঁদের দিকে তাকাবেন না। প্রকৃতি সুধারস পেতে প্রকৃতি প্রিয়াদেরকেই তিনি অনবরত আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন :

এসো আমার শ্রাবণ-নিশি
এসো আমার শরৎলক্ষ্মী,
এসো আমার বসন্তদিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী। (অনবসর, *ক্ষণিকা*)

এখানে কেবল 'পুরাতন সহচরী' যে ছেড়ে চলে গেছে তার জন্য বৃথা বিলাপ করে বৃথা সময় নষ্ট করার সময় নেই। 'এ অবস্থায় সময়ের দাবি মেনে তাৎক্ষণিককে গ্রহণ করাই তো ভালো' (সৈয়দ, ২০১৪ : ১২২)। কারণ, হতাশ সেই-ই হয় যার হতাশ হওয়ার সময় থাকে। তিনি তাই বারবার এই 'অনবসর' কবিতায় ঘোষণা দেন :

'সময় যে নেই, সময় যে নেই'।

কবি প্রকৃতির 'নতুন আঁখির দৃষ্টি চুম্বকে' বাধা পড়ে 'প্রকৃতির নিত্যপরিবর্তনকে' অবজ্ঞা করাটাকে 'বড়োই বর্বরতা' বলে মনে করেন। 'প্রতিজ্ঞা' কবিতায় রসিক কবি তো সরাসরি ঘোষণা দিয়ে দিলেন:

আমি হব না তাপস, হব না, হব না,
না পেলে তপস্বিনী" (প্রতিজ্ঞা, *ক্ষণিকা*)

মর্ত্যজীবনে আনন্দরস ও সৌন্দর্য-উপকরণের সন্ধান পেলেই সে জীবন গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। উদাসীন সন্ন্যাসী হয়ে হৃদয়ে নতুন নতুন ভুবন গড়ে নিতে পারেন, যদি পাশে তপস্বিনী সঙ্গী মেলে।

'পথে' কবিতায় প্রকৃতিমুগ্ধ কবি পথ চলার আনন্দে অকারণে গাঁয়ের পথ দিয়ে হেঁটে চলেন। সৌন্দর্য লাভের সন্ধানে 'এ যেন এক নান্দনিক গ্রাম-ভ্রমণ' (সরকার, ২০১৫ : ৪৩)।

দিঘির জলে ঝলক ঝলে
মানিক হীরা,
সর্ষেখেতে উঠছে মেতে
মৌমাছিরা।

এ পথ গেছে কত গাঁয়ে
কত গাছের ছায়ে ছায়ে
কত মাঠের গায়ে গায়ে
কত বনে।
আমি শুধু হেথায় এলেম
অকারণে। (পথে, *ক্ষণিকা*)

মনঃপ্রজ্ঞা অনুভবেই এ সৌন্দর্য ধরা পড়ে। "এই সহজ প্রকৃতিই রবীন্দ্রনাথকে আবেগাকুল করে, নিয়ে যায় ভাবনা ও আপন সত্তার অন্তস্তলে" (সিরাজ, ২০১১ : ৫৪)।

অলসভরে নদীর কূলে দিনমান বসে থেকে প্রকৃতিসুধা গ্রহণ করার কথা আছে 'কূলে' কবিতায়। জলের পাশে সেখানে সকালের আলো এসে পড়ে, অলসবায়ুতে দু'একটি নৌকা চলে, সেখানেই খেঁজুর গাছের বেঁকে যাওয়া ডালে যেখানে মাছরাঙা এসে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়ে , সেই 'ভাঙন-ভরা কূলে'র নির্জনে বসে মনে যদি প্রশ্ন জাগেঃ

আর কিছু কি চাই।
সে কহিল, ভাই,
না–ই, না–ই, নাই গো আমার কিছুতে কাজ নাই। (কূলে, *ক্ষণিকা*)

৬.

স্থান ও সময়ের বৈচিত্র্যে মন একেক ভাবে সাড়া দেয়। *দুই তীর* নামের প্রকৃতিস্নিগ্ধ একটি চমৎকার কবিতা তেমনই অনুভবে লেখা। দুই তীরের অধিবাসীর মাঝে আছে অর্থবহুল নদী, যা সময়ের মতোই প্রবহমান। একপারে শরৎকালের চর, অন্যপারে ঘনছায়ার বন।

তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী
দুই তটেরে একই গান সে
শোনায় নিরবধি।
... ...
তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আরেক অর্থ
ঠেকে আমার কানে। (দুই তীর, *ক্ষণিকা*)

এক গাঁয়ে নামের আরেকটি অসাধারণ কবিতায় সৌন্দর্য সময় ও আনন্দের গানই যেন গেয়েছেন। গাঁয়ের দুইটি কাছাকাছি পাড়ায় দু জন বসবাস করে। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সকল অপরূপ সজ্জায় সমৃদ্ধ স্থানে তারা দুজনেই আছেন এটাই তো আনন্দ।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচ জনে–
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।
(এক গাঁয়ে, *ক্ষণিকা*)

কবি একটি প্রবন্ধে বলেছেন,

“আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে” (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৬৮)।

সুখদুঃখ কবিতায় তেমনি একটি অবস্থার বর্ণনা আছে। রথের তলায় যে স্নানযাত্রার মেলা বসেছে, সেখানে দু'জনের মনের অবস্থাকে দেখতে পাই। একটি মেয়ে তালপাতার বাঁশি কিনে ও বাজিয়ে আনন্দিত, কিন্তু যে ছেলেটি একটি পয়সার অভাবে ‘একটি রাঙা লাঠি’ কিনতে পারলোনা তার ‘অরুণ’ নয়ন মেলাটিকেই যেন ‘করুণ’ করে তুলেছে। মনের আনন্দময় এবং দুঃখময় অবস্থা এখানে বস্তুগত বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল। যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়িত্ব পায়। রবীন্দ্রনাথ আরেকটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন :

> আমাদের যথার্থ বন্ধন কালের বন্ধন। যখন আমরা কোন ব্যথা বোধ করি তখন সেই ব্যথা বর্তমানের খুঁটির সঙ্গে আমাদের জোর করে বেঁধে রাখে। সেই হচ্ছে দারিদ্র্য যা উপস্থিতের ভাবনা দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে, ভবিষ্যতের দিকে যার আশার জানালা খোলা নেই। সেই হচ্ছে অকিঞ্চন, কালের ক্ষেত্রে যার ঘরমাত্র আছে কিন্তু আঙিনা নেই”। (বিজন, ২০১৩ : ১৫২)

সংসারের দৈনন্দিন যাপনে আমরা যেন কোন আবর্তে বাধা না পড়ি সে সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ একবার বলেছেন :

> “দৈনন্দিনের একটা ক্লীব আবর্ত আছে, সে আমাদের জড়িয়ে ফেলতে চায় গ্লানির পাকে, এর থেকে দূরে দাঁড়াবার মতো একটা আসক্তিহীনতার খুব দরকার। আর সেইখানে দাঁড়াতে পারলে তবেই জীবনের প্রতিটি বিন্দুর জন্য মায়ায় ভরে ওঠে মন, এই এক রহস্য” (শঙ্খ, ২০১৪ : ৩০৩)।

রবীন্দ্রনাথ *ক্ষণিকা*র প্রথম ভাগে জীবনের অবস্থা যেমনই হোক, কোন কিছুতেই হতাশ না হয়ে আনন্দ উদযাপনের কথাই জানিয়েছেন। এই সংসারে সুখ ও দুঃখ দুইই আছে, দুইই সত্য। এই ভারসাম্যেই পথ চলতে হয়।

৭.

*ক্ষণিকা*র দ্বিতীয় ভাগে কবি যাত্রাপথে অনেকটা স্থির ও সমাহিত। গাড়ি চলতে চলতে থামার আগে যেমন গতি কমিয়ে দেয় অনেকটা তেমনই। এ যেন জীবনের আরেক ধাপে, নতুন বাঁকে চলার প্রস্তুতি। প্রমথনাথ বিশী এর মতে, "*ক্ষণিকা*কাব্য যৌবন ও পৌঢ়ত্বের সীমান্ত; ...এ যৌবন-বিদায় অনিচ্ছুক যযাতির ক্ষুব্ধ ক্রন্দনে ধ্বনিত নহে, দিবস সন্ধ্যায় যেমন, নদী সমুদ্রে যেমন, ফুল ফলে যেমন, অতি অনায়াসে, অতি অলক্ষ্যে, একটির আর একটিতে পরিণতি" (প্রমথনাথ, ১৩৬৩ : ১৪৩)। চল্লিশের ঘাট থেকে যৌবনের তরীকে বিদায় জানিয়েছেন। এবার তিনি এর থেকে ছুটি নেবার জন্য প্রস্তুত ।

অনেক খেলা, অনেক মেলা,
সকলই শেষ করে
চল্লিশেরই ঘাটের থেকে
বিদায় দিনু তোরে। (যৌবনবিদায়, *ক্ষণিকা*)

এই তরীর বাণিজ্যে লাভের হিসাব করবেন না।

সন্ধ্যা এলো, দোকান তোলো–
পারের নৌকা তৈরি হল,
কী হবে ভাই হিসেব নিয়ে।
তোমার নয়কো লাভের খাতা। (শেষ হিসাব, *ক্ষণিকা*)

শেষ হিসাব কবিতায় আরো বলেছেন, "ফুলের দিনের যে মঞ্জরী / ফলের দিনে যাক সে ঝরি।"

বিলম্বিত কবিতায় তাই তার পরবর্তী পথের কথা জানিয়ে দিচ্ছেন,

এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা
এখন গাঁথো অন্য ফুলে
অন্য ছাঁদের মালা। (বিলম্বিত, *ক্ষণিকা*)

এমনি করে এক জীবন থেকে বিদায় নিয়ে আত্মোপলব্ধির এক নতুন অধ্যাত্মবোধের জীবনে তিনি যাত্রা করেছেন। "কবি এতদিনের আরাধ্য জীবন, সৌন্দর্য-মাধুর্য, প্রেম-প্রীতির উচ্ছল আনন্দময় সময় অতিক্রম করে জীবনে বৈরাগ্যসাধনা বা কঠোর তপস্যার সুকঠিন সময়ে উপনীত" (আবু, ২০১৫ : ১১৩)।

৮.

ফরাসি দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও ঐতিহাসিক ভিক্টর কুঁজ্যা (১৭৯২-১৮৬৭), "পৃথিবীর যাবতীয় দার্শনিক চিন্তাভাবনাকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন– ইন্দ্রিয়বাদ, আদর্শবাদ, সন্দেহবাদ ও অধ্যাত্মবাদ" (বিজন, ২০১৩ : ৩৯৪)। বেগম আকতার কামালের মতে,

> রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদ মনুষ্যপ্রেমে উজ্জ্বল, আত্মশক্তির উদ্বোধনে সক্রিয়, চৈতন্যের শুদ্ধতায় নিয়োজিত এবং এতে আছে ব্যক্তির বিশ্বজাগতিক অভিসার, মিলনের আকুতি ও স্বার্থহীনতা । (আকতার, ২০১৪ : ২৭)

কারণ আমরা আগেই জেনেছি যে,

"রবীন্দ্রনাথ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভালোবাসতেন। সে ভালোবাসা ভোগের ভালোবাসা নয়, সুখের ভালোবাসা নয়, ভোগ ত্যাগ সমান দৃষ্টিতে নিয়ে নিয়ে সুখদুঃখের তালে তালে সমানভাবে পা ফেলে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার আনন্দ। সে আনন্দ কোন প্রাপ্তিতে নয়, বিশুদ্ধ অনুভবে" (বিজন : ২০১৩ : ৬০)। রবীন্দ্রনাথ এবারে গভীর অধ্যাত্মবোধের জীবনে প্রবেশের অপেক্ষায়।

সেই অনুভবশক্তিতেই রবীন্দ্রনাথ জানান,

> আমরা আমাদের সুখদুঃখের চেয়ে বড়, আমরা প্রতিদিনের তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের পরিহার, এই আমাদের ক্ষণিক জীবনের প্রধান নিয়ম; কিন্তু এক একটা সময় আসে যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, আমাদের ভিতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটেনা। তখন আমরা আমাদের ক্ষণিক জীবনটাকে পরাভূত করেই একটা আনন্দ পাই, দুঃখকে গলায় হার করে নিয়েই মনে উল্লাস জন্মায়। তখন মনে হয় অন্তরের সেই স্বাধীন পুরুষের বলেই সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে আমি আমার প্রকৃতির সফলতা দান করবো। (বিজন, ২০১৩: ২৪৫)

*ক্ষণিকা*র শেষ পর্বে বরষার প্রকৃতিতে এসে কবির উপলব্ধিগত এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথের একুশ বছর বয়সের একটি লেখা 'বসন্ত ও বর্ষা' প্রবন্ধে বলেছেন, "বর্ষাকালে আমি আত্মা চাই, বসন্তকালে আমি সুখ চাই।...বসন্ত আমাদের মনকে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, বর্ষা তাহাকে একস্থানে ঘনীভূত করিয়া রাখে" (জগদীশ, ২০০১ : ৪৪২)। এই পর্বে তিনি একাত্ম অনুভবে উপলব্ধির জগতে প্রবেশ করেছেন। তাই ক্ষণিক জীবন ছেড়ে তিনি চিরজীবনের আহ্বান শুনতে চান। যে জীবন ক্ষণিক জীবনের সুখদুঃখ নেয় না। তার থেকে একটা তেজ সঞ্চয় করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্ছে, আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাগহীন চির অগ্নি সঞ্চয় করছে। আমাদের প্রতিদিনের

> মুহূর্তের পল্লবরাশি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত প্রবহমান সুখদুঃখের উত্তাপেই শুষ্ক হয়ে, দগ্ধ হয়ে ঝরে পড়ে যাচ্ছে; কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতি মুহূর্তের দাহ স্পর্শ করতে পারছে না। অথচ তার তেজটুকু সে ক্রমাগতই গ্রহণ করছে। যে মানুষের প্রতি মুহূর্তের সুখদুঃখভোগ শক্তি সামান্য, তার দাহ-ও অল্প, তেমনি তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অকিঞ্চিৎকর। (বিজন, ২০১৩ : ২৮৪)

এই দর্শন একাকিত্বের দর্শন। মানুষকে এই দর্শনের ঐশ্বর্য একাকী অর্জন করতে হয়। মনোরঞ্জন (১৯৬২) এর মতে, মানুষ অধ্যাত্ম পর্যায়ে অসীমের স্পর্শ পেতে চায় এবং সে প্রেরণাতেই সৃষ্টি প্রেরণা অনুভব করে। সে অনুভবকে পাওয়া গেলে তা সর্বমানবের হয়ে ওঠে। তাই 'শেষ হিসাব' কবিতায় কবির মন দীর্ঘশ্বাসে বলে ওঠে :

'তুমি একা জগৎ-মাঝে/ প্রাণের মাঝে আরেক একা।' এই দীর্ঘশ্বাসের প্রভাবে পরবর্তী কবিতায় জানান :

থাকব না ভাই, থাকব না কেউ–
থাকবে না ভাই কিছু।
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু।
... ...
জগৎটা যে জীর্ণ মায়া
সেটা জানার আগে
সকল স্বপ্ন কুড়িয়ে নিয়ে
জীবন-রাত্রি ভাগে। (শেষ, *ক্ষণিকা*)

তাই বলে সব কিছুকে 'মিথ্যে মায়া' বলে কোনমতেই থামা চলবে না। গলায় পরা মালা শুকিয়ে গেলেও নতুন গানের আশায় পথ চলতে হয়। "মানুষের মৃত্যু হয়। মানব তবু প্রবহমান। এই প্রবহমানতাকে মেনে নিতে হয়। কালের পিছু ধাওয়া করার মাঝে আনন্দ। যেন পথ চলাতেই আনন্দ। পথে পথে কত বিস্ময়, কত অভিজ্ঞতা" (সরকার, ২০১২ : ৭৬)। ক্ষণিক জীবনের আনন্দ-বেদনা উপভোগের তেজ সঞ্চয় কওে, কবি জীবনের আরেকটি নতুন বাঁকে যাওয়ার পথে। এমন সময়ে আষাঢ়ের প্রকৃতিমুগ্ধতায় তাই পরম অন্তরতমকে পাওয়ার আশায় বলছেন,

এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরান ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়–
আজি জলভরা বরষায়। (আবির্ভাব, *ক্ষণিকা*)

অন্তরতম যে জন সে তো কখনো সৌন্দর্যময়ী গৃহলক্ষ্মী, কখনো বিচিত্র কল্যাণীরূপে আবির্ভূত, কখনো সে জীবনদেবতার অনুভবে মিশে যায়। সেই অন্তরতমকে আঁখি মেলে পাওয়া যায় না। স্বপনেই সে ধরা দেয়। তাই সব আয়োজন শীঘ্র করে সেরে নিয়ে তার জন্য সময় রাখতে হয়।

এ সময়ে কবির মনে হয়,

মন-দে'য়া-নে'য়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে–
নূপুরের মতো বেজেছি চরণে
চরণে।
... ...
এতদিন পরে ছুটি আজ ছুটি,
মন ফেলে তাই ছুটেছি;
তাড়াতাড়ি ক'রে খেলাঘরে এসে
জুটেছি। (উদাসীন, *ক্ষণিকা*)

এবারে তিনি নিঃসঙ্গতার পথে যাত্রা করেছেন। কিয়ের্কেগার্দের[৮] মতে, "প্রত্যেক মানুষের ভেতরেই একটি নিভৃত ঝর্না-উৎস আছে" (বিতশোক, ২০১৫ : ৭২)। সেখানে সবই নীরব, প্রগাঢ় স্তব্ধতায় সেখানে ঈশ্বর বা অন্তরতম জন বসবাস করেন। তাকে ভুলে থাকা মানে নিজেকেই ভুলে থাকা।

সেই অন্তরতম যে জন তার জন্য 'সর্বশেষের' একটি গান তিনি গোপনে হৃদয়ে রাখেন–

নানা রাগিনীতে দিয়ে নানা তান,
এক গান রাখি গোপনে।
নানামুখ পানে আঁখি মেলি চাই,
তোমা-পানে চাই স্বপনে। (অন্তরতম, *ক্ষণিকা*)

*ক্ষণিকা*র পাতার কুটিরে তারই প্রদীপের আলোয় ধীরে ধীরে তাকে দেখতে চেয়েছেন।

এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে,
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ–
ক্ষমা করো যত অপরাধ। (আবির্ভাব, *ক্ষণিকা*)

"অন্ধকারেই অন্তরতমের আলোক জ্বলে ওঠে" (সিরাজ, ২০১১ : ৫৭)। সেই আলোর প্রেরণাতেই 'সুদূরের পিয়াসী' রবীন্দ্রনাথের পথ চলা। "ক্ষণিকার এই অধ্যাত্ম জাগরণ একান্ত আকস্মিকভাবে কবির এক প্রকার অজ্ঞাতেই ঘটিয়া গিয়াছে। নিয়তির অমোঘ নিয়মের যশে 'ক্ষণ' চেতনার লোক হইতে শাশ্বত অধ্যাত্ম-লোকে অধিষ্ঠিত হইয়া যাইতে কবি স্বয়ং বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন" (মনোরঞ্জন, ১৯৬২ : ২৫৩)।

'উদ্‌বোধনে'র মতো *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থ শেষে আছে 'সমাপ্তি' নামের সহজ সরল অবসানের কবিতাখানি। সন্ধ্যার মুহূর্তে দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণে কবি সমাগত। সবাই তখন চলে গিয়েছে, তখন কবি নিজেকে দেখতে পান:

তোমার নীরব নিভৃত ভবনে
জানি না কখন পশিনু কেমনে।
অবাক রহিনু আপন প্রাণের নূতন গানের রবে।
কখন যে পথ আপনি ফুরালো, সন্ধ্যা হলো যে কবে! (সমাপ্তি, *ক্ষণিকা*)

সেই নতুন সুর ও গানের লগ্নে এতদিনকার লুকোনো কোনো অশ্রুজলের রেখা যেন সে অন্তরতম না দেখতে পান। এভাবেই কবি উপলব্ধির জগতে, অধরা সৌন্দর্যের জগতে কবি পৌঁছাতে চান। সিরাজ সালেকীন (২০১১) ব্যাখ্যা করেন যে, বাউলহৃদয়ের কবি পরমকে নিজের চেতনা দিয়ে নিজেরই ভেতরে অনুভব করেন। এই চেতনার খোলা পথেই তিনি নিঃসংশয়ে 'নৈবেদ্য'র শুভচেতনার বোধের জগতে প্রবেশ করতে পেরেছেন। সে শুভবোধ[৭] পরম আলো বা আত্মশক্তিজাত ঐশ্বরিক অনির্বাণ আলোকিত বোধ।

৯.

দর্শনের একটি ধারা আছে যাকে প্রতিভাসবিজ্ঞান বলে। দার্শনিক ও অংকশাস্ত্রবিদ এডমুন্ড হুর্সাল এর জনক। কিয়ের্কেগার্দের অস্তিত্ববাদের সূত্র ধরে এই অস্তিমূলক প্রতিভাসবিজ্ঞানের এর আলোচনা।

"হুর্সালের আলোচনা সীমিত থাকে মানুষের চেতনা অথবা জ্ঞানের মধ্যে" (বিতশোক, ২০১৫ : ১০৩)। মানুষের মন অভিব্যক্তিনির্ভর। "ব্যক্তি মনের অর্ন্তনিহিত কোণে যা সংগঠিত হয়, তা প্রকাশ পায় তার অভিব্যক্তিতে।...ব্যক্তির আবেগ, অনুভূতি, আতঙ্ক, হতাশা, নিঃসঙ্গতা প্রভৃতি প্রকাশ পায় তার অভিব্যক্তিতে" (বিতশোক, ২০১৫ : ১০৯)। একে হুর্সাল 'ইচ্ছার প্রতিভাসবিজ্ঞান' বলেন। যা 'অহম' এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এর মাধ্যমেই ব্যক্তি স্বাধীনভাবে চিন্তাজগতে বিচরণ করতে পারে। অন্যদিকে, মনের অস্তিত্বের আছে দুই স্তর। উচ্চতর ও নিম্নতর স্তর। "আধ্যাত্মিক স্তরই উচ্চতর স্তর। পার্থিব জগতের সাথে যা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, তা জীবনের নিম্নতর স্তর। একটি স্তর অপর স্তরে রূপান্তরযোগ্য নয়" (বিতশোক, ২০১৫ : ৯৯)।

হুর্সাল জীবন জগতের স্তর (Life-world) বলে একটি স্তরের কথা বলেছেন, "জীবনের সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না, আবেগ অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতির স্তরও এটি। এসবই মানসিক প্রতিভাসের ফসল" (বিতশোক, ২০১৫ : ১০০)।

পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে প্রতিনিয়ত অসংখ্য ঘটনা একইসাথে ঘটে চলেছে। যাবতীয় ঘটনার সাথে মানুষ স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রত্যক্ষণ দিয়ে সংযুক্ত বা বিযুক্ত হতে পারে। "এই স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের কর্মতৎপরতার একটি বিরাট ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেয়। তদুপরি, এর মধ্য দিয়ে অবহিত হওয়া যায় মানুষের বিশাল কর্মদক্ষতা সম্পর্কে। এই ক্ষমতা বলেই বিশ্বজগতে মানুষ কেবল নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে না; বরং সুন্দরভাবে এই পৃথিবীকে সুসজ্জিত করার কাজেও এটি ব্যবহার করে থাকে" (বিতশোক, ২০১৫ : ১০৭)। অর্থাৎ এই অভিব্যক্তি বা স্বাধীন কর্মতৎপরতার ওপর ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে। মনোনয়নের এই স্বাধীনতা ব্যক্তি মনেই সংগঠিত হয়। কোন ক্রিয়ার নৈতিক কর্তা হওয়া ব্যাপারটা একটা নান্দনিক সিদ্ধান্ত। জীবনের নিম্নতর স্তরে ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ আধ্যাত্মিক স্তরে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্তরণ ঘটতে পারে।

মনঃপ্রজ্ঞা একাগ্র মন, একজন নীতিবোধ[১০] সচেতন মানুষ। সময়ের সৌন্দর্যকে অনুভব করার পাশাপাশি সে ইতিবাচকভাবে সময়কে বদলে দিতে পারে। একজন নৈতিক মানুষ (ethical man) মনের সার্বক্ষণিক চিন্তাভাবনা লব্ধ ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগ করলেও এসব তাকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে বাহিত করে। এই লক্ষ্য থেকেই মানুষ পায় জীবনের দিক নির্দেশনা (বিতশোক, ২০১৫: ৯৩)। যে দিক নির্দেশনার আলোকে সে দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন হয়। যা জীবনের অবস্থান, প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুধাবনের উপলব্ধি দেয়। এভাবে সে একজন সার্বিক মানব (universal man) এ উন্নীত হয়। এটাই জীবনের আধ্যাত্মিক স্তর।

মাইন্ডফুলনেস বা মনঃপ্রজ্ঞা ব্যক্তিকে অনবরত ভেতরের দিকে নিয়ে যায়। বাইরের বস্তুপৃথিবীর ও অস্তিত্বের সাথে সুসংগত বোধ করায়। চৈতন্য (consciousness) বাড়ায়। চারপাশের অসংখ্য বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে, আমাদের থামতে শেখায় (STOP)[১১], মস্তিষ্কে জায়গা (space) তৈরি করে ইতিবাচকভাবে স্মিতভাবের দিকে নিয়ে যায়। এভাবে আমরা আত্মউপলব্ধিতে পরম এর সাথে সংযোগ অনুভব করে কৃতজ্ঞচিত্ত হতে পারি। নান্দনিক জীবনের (esthetic life) স্বাদ অনুভব ও উপলব্ধি করতে পারি।

১০.

মানুষ একইসাথে জৈবিক ও মানসিক বৃত্তি সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক জীব। মানুষেরই শুধু সৌন্দর্যবোধ আছে। সৌন্দর্যবোধের অনুশীলনেই মানুষ সংযমী ও কল্যাণধর্মী মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে। সৌন্দর্যবোধ ছাড়া মানুষের সম্প্রসারণ হয় না, ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে না। সৌন্দর্যবোধ একটি মানসিক বিষয়। আবেগের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিষয়। এটি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হলেও ইন্দ্রিয়াতীত বোধের কাছে

নিয়ে যায়। দেহ, প্রাণ, মন, জ্ঞান আর আনন্দ নিয়ে যে আত্মা, সেই আত্মারই একটি বিশেষ ধর্ম এই সৌন্দর্যবোধ। যে আত্মা প্রকৃতি ও অন্যান্যদের সাথে বৃহৎ চৈতন্যের সাথে একাত্ম হতে চায়। সৌন্দর্য মিলনের সেতু।

সামঞ্জস্যপূর্ণ, বৈচিত্র্যময়, সরল ও সমগ্রতা বিশিষ্ট কোনো সত্য বিষয় হৃদয়কে বিস্মিত ও আনন্দিত করলে তাকে সৌন্দর্যবোধ বলতে পারি। সময়কে যদি অনন্ত অন্ধকার ভাবি তবে তাতে সৌন্দর্যের আলো ফেলেই চলতে হয়। সময়ের সঙ্গে, হৃদয় এক সুরে (harmony) বাধা পড়ে তখনই আমরা সত্যকে, সুন্দরকে, আনন্দকে লাভ করি। এটি হৃদয়কে প্রসারিত ও গতিশীল করে। সৌন্দর্যের অনুভূতি হৃদয়কে যেমন প্রশান্তি দেয় তেমনি অতৃপ্তি জাগিয়ে অব্যক্ত বেদনাবোধ তৈরি করে। যে বেদনা জীবনকে পরিশীলিত করে, নির্মাণ করে, সৃষ্টির প্রেরণা জাগায়। রোমান্টিক অনুভবে রবীন্দ্রনাথ *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি সৌন্দর্যের মুখোমুখী হয়ে সৌন্দর্যকে চিনিয়েছেন। ক্ষণিকের আনন্দ উপভোগে আমরা যে আনন্দ লাভ করি তা মনের অ-আধ্যাত্মিক স্তর (non-spirutual)। উপভোগ ও প্রশান্তিই এর মূল লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ মনোপূর্ণ অনুভবে *ক্ষণিকা*য় দেখিয়েছেন কীভাবে সময়কে উপভোগে, উদযাপনে, সহজিয়া মনে ও উপলব্ধির আধ্যাত্মিক স্তরে (spirutual) পৌঁছানো যায়। মানবপ্রেমিক ও প্রকৃতিপ্রেমিক কবি সৌন্দর্যবোধের মাধ্যমে নান্দনিক ও আত্মিক জীবন যাপনের পথ দেখিয়েছেন এই *ক্ষণিকা*য়।

নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আকুতি মানুষের মাঝে প্রবল। নিজেকে বেশী করে পাওয়ার আরেক নাম আনন্দ। আমাদের চারদিকের রসহীন বিষয়, আমাদের অনেক সময় বস্তুর মতো অসাড় করে রাখে। মনঃপ্রজ্ঞার অনুভব আমাদের চৈতন্যকে অসাধারণভাবে উদ্বোধিত করে। কোন তুচ্ছ বিষয়েও তখন স্বাধীন ও সচেতনভাবে সংযুক্ত হতে পারি। বাইরের জগতের কোনো বিষয়ে, মন মোহমুক্ত ও নির্মল দৃষ্টি দিতে পারে। এতে নিজেকে ও সময়কে নিবিড় করে পাওয়া যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথেও মানুষ সংযোগ অনুভব করে। তখন আত্মা বা চৈতন্য নিষ্ক্রিয় অবস্থা থেকে পূর্ণভাবে স্পষ্ট ও সংহত হয়ে জেগে ওঠে। মনে আলোর সংযোগ বাড়ায়। এভাবে মানুষ নিজেরই আত্মচৈতন্য বা আনন্দময় সত্তাকে অনুভব করে। এই নিবিড়তার মাঝেই সৌন্দর্য ও আনন্দ। ক্ষণিক মুহূর্তকে যদি অমর করে নিজের মনের আয়নায় প্রতিবিম্বিত করি, তবে নিজেই সত্য হয়ে উঠতে পারি। ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার এই প্রকাশেই আমরা পৃথিবীর সময়ের মানচিত্রে স্পষ্ট হই। এটাই সৌন্দর্য, এটাই আনন্দ। *ক্ষণিকা*য় মহৎ আত্মার কবি রবীন্দ্রনাথ সেই বিশুদ্ধ আত্মার ও আনন্দের গান 'অকারণ পুলকে'ই অসাধারণভাবে গেয়েছেন। মানুষের মন ও সময় মনঃপ্রজ্ঞার বোধে নিত্যতার আলোয় আলোকিত হয়ে চির অক্ষয় হোক। শান্তি নেমে আসুক মনে, মননে।

টীকা :

১. এই প্রবন্ধে আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) বক্তব্যর বিষয় ছিলঃ জীবনের উদ্দেশ্য, সহৃদয়তা, সৌন্দর্য এবং সত্যের আদর্শভাবনা যা বাদ দিলে জীবন শূন্যময় হয়ে পড়ে, গণতন্ত্রের নীতি বিষয়ে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ এবং সমস্ত ধরণের হিংসার প্রতি তাঁর ঘৃণা।

২. Mindfulness: Paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment and non-judgmentally- Jon Kabat Zinn.

৩. 'বিখ্যাত ব্যারিস্টার তারকানাথ পালিতের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিত। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি ওমর খৈয়মের পঁচিশ রুবাই এর পদ্যানুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতাও ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৪৮৩)

- 'বিলাতে যখন আমি য়ুনিভার্সিটি কলেজে ইংরেজি-সাহিত্য-ক্লাসে (ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি মর্‌লি) তখন সেখানে সেখানে লোকেন পালিত (জন্ম? ১৮৬৫) ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। বয়সে সে আমার চেয়ে বছরচারেকের ছোটো;... সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওয়ার মতো অগ্রসর করিয়াছে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৫ঃ ১২০)
- 'রবীন্দ্রনাথের প্রায় পারিবারিক বন্ধুর মতো ছিলেন লোকেন্দ্রনাথের পিতা তারকানাথ পালিত। সেই সূত্রে, আই.সি.এস. হয়ে দেশে ফেরবার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ চলেছিল এবং এই যোগাযোগ, রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের সাহিত্যবন্ধুদের অনেকের তুলনায়, বেশি দিন স্থায়ী হয়েছিল। লোকেন পালিতের কর্মস্থলে রবীন্দ্রনাথ অনেক বার অতিথি হয়ে গেছেন, এবং সেখান থেকে কবিতা লিখেছেন। পালিত যখন রাজশাহীতে জেলাজজ তখন তাঁর কুঠিতে বসেই রবীন্দ্রনাথ *পঞ্চভূতের ডায়েরি* ফেঁদেছিলেন। পালিত নিজেও কবিতা লিখতেন, তবে বাংলায় নয়, ইংরেজীতে (ওমর খয়্যামের রুবাইয়াতের কয়েকটি শ্লোক লোকেন্দ্রনাথ ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন)। তাঁর একটা কবিতা (শেষ উপহার) রবীন্দ্রনাথ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। সে কবিতাটি *মানসী*তে আছে।' (সুকুমার, ১৩৯০ঃ ১২৭)
- লোকেন্দ্রনাথের সংস্কৃতি ও মানসিকতা সমসাময়িকদের তুলনায় স্বচ্ছ ও নির্বাধ ছিল এবং তাঁর দৃষ্টি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে হোক বা অন্য যে কোন কারণে হোক, বেশ 'আধুনিক' অর্থাৎ বিজ্ঞানুসারী ছিল। লোকেন্দ্রনাথের স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি ও তীক্ষ্ণ বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং সেইসঙ্গে অসাধারণ 'সাধারণ জ্ঞান' ইউনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরীতে সেই প্রথম দিনটি থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। (সুকুমার, ১৩৯০ : ২৯)

৪. ওমর খৈয়ম (১০৪৮-১১৩১) : ইরানের অংকশাস্ত্রবিদ, জ্যোতির্বিদ ও কবি।

৫. 'চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪- ১৯১০) রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকের নিকট সামাজিক বিষয়ে ও ধর্মমতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষরূপেই পরিচিত' । (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৬ : ৬০২)

৬. কালের অন্তত তিনটি তীর রয়েছে যেগুলি অতীত এবং ভবিষ্যতের ভিতর পার্থক্য করে। সেগুলি হলো তাপগতীয় তীর অর্থাৎ যে অভিমুখে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, মনস্তাত্ত্বিক তীর অর্থ্যাৎ কালের যে অভিমুখে আমরা অতীত স্মরণ করি কিন্তু ভবিষ্যৎ স্মরণ করিনা এবং মহাবিশ্বতত্ত্বভিত্তিক তীর অর্থ্যাৎ যে অভিমুখে মহাবিশ্ব সংকুচিত না হয়ে সম্প্রসারিত হয়। আমি দেখিয়াছি মনস্তাত্ত্বিক তীর এবং তাপগতীয় তীর মূলত অভিন্ন, সুতরাং এই দুই তীর মূলত অভিন্ন, সুতরাং এই দুটি তীরের অভিমুখ সব সময়ই অভিন্ন হবে। (স্টিফেন, ২০১৬ : ১৫৮)

৭. "'কালত্রয়াবোধিতম্ সত্যম' যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালে সমভাবে অবাধে অবস্থিতি করে, যাহার কস্মিন কালেও কোনো পরিবর্তন হয় না, তাহাই সত্য"। (চারুচন্দ্র, ১৪১৭ : ১৪)

৮. সোরেন কিয়েকেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫) : ডেনমার্কের দার্শনিক। দর্শনের জগতে এক মহাকাব্য অস্তিত্ববাদের জনক। অস্তিত্ববাদ আশাবাদী ও সক্রিয় মতবাদ। এই মতবাদ বিশ্বাস করে, Existence is only "here" and "now".

৯. "শুভবোধে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই কবি জীবনপথের গতি ও গভীরতার সন্ধান পেয়েছেন। সেই পথেরই এক প্রান্ত *গীতাঞ্জলি*-পর্ব।" (সিরাজ, ২০১০ : ১২৯)

১০. আইনস্টাইন একবার এক ধর্মযাজককে (রেভা. কর্নেলিয়াস গ্রিনওয়ের কাছে পত্র, ১৯৫০) বলেছিলেন, "মানুষের সব কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নীতিবোধ বজায় রাখা। আমাদের চারিত্রিক ভারসাম্য এবং এমনকি আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে এই নীতিবোধের ওপর। শুধু আমাদের কাজের নৈতিকতাই আমাদের জীবনে সৌন্দর্য ও মর্যাদা প্রদান করে।" (হারুন, ২০১০ : ৪৭)

১১. (STOP: S-Stop, T- Take a deep breath, O-Observe, P-Proceed with kindness/gratitude and a smile). 'We make purposeful pauses during our day. STOP and bring ourselves to moments of micro meditations, we start living mindfully, radically alive in our ordinary experiences making it extraordinary with only full awarnes!' (ChildNeuropsychiatrist/ change agent and film Director Amit Ranjan Biswas: facebook status)

গ্রন্থপঞ্জি

১. আবু ইসহাক ইভান (১৯১৫)। রবীন্দ্রনাথ : কবি ও কাব্য, মুক্তধারা, ঢাকা
২. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা. ১৩৯৫)। রাতের তারা দিনের রবি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৩. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (১৩৭৫)। বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব, সংস্কৃতি প্রকাশন, কলকাতা
৪. কাজী নজরুল ইসলাম (২০০৭)। নজরুল রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা
৫. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৪১৭)। রবি রশ্মি, দেবুক স্টোর, কলকাতা
৬. জগদীশ ভট্টাচার্য (২০০১)। রবীন্দ্র কবিতাশতক তিন দশক, ভারবি, কলকাতা

৭. ড. খনা মুখোপাধ্যায় (১৯৭৮)। রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়, জিজ্ঞাসা, কলকাতা

৮. ড. জয়শ্রী চক্রবর্তী (১৩৯৭)। রবীন্দ্রপত্র : রবীন্দ্রভাবনা, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা

৯. ড. মনিরুজ্জামান (২০১১)। রবীন্দ্র চিন্তা, শব্দচাষ প্রকাশন, চট্টগ্রাম

১০. নীহাররঞ্জন রায় (১৩৬৯)। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

১১. সুপ্রিয় ঠাকুর (২০০০)। রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১২. প্রশান্তকুমার পাল (১৩৯৫)। রবিজীবনী, চতুর্থ খণ্ড (১৩০১-১৩৯৭), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৩. প্রমথনাথ বিশী (১৪১৫)। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৩৯২)। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা

১৫. বিজন ঘোষাল (২০১৩)। রবীন্দ্রপত্রাভিধান, চতুর্থ খণ্ড, পত্রলেখা, কলকাতা

১৬. বিতশোক ভট্টাচার্য, সুবল সামন্ত (সম্পা. ২০১৫)। কিয়ের্কেগার্দ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

১৭. বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। রবীন্দ্রনাথ, যেথায় যত আলো, অবসর, ঢাকা।

১৮. বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মভাবনা, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

১৯. মনোরঞ্জন জানা (১৯৬২)। রবীন্দ্রনাথ : কবি ও দার্শনিক, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা

২০. শঙ্খ ঘোষ (২০১৪)। নির্বাচিত প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

২১. শ্রী বিশু মুখোপাধ্যায় (১৩৬৯)। রবীন্দ্র-সাগর সংগমে। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা।

২২. শ্রী প্রমথনাথ বিশী (১৩৬৩)। রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা

২৩. শারমিন আহমদ (২০১৭)। মুক্তির কাণ্ডারী তাজউদ্দীন : কন্যার অভিবাদন, ঐতিহ্য, ঢাকা

২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৫)। জীবনস্মৃতি, সংস্করণ, ঢাকা

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১৬)। রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বিংশ খণ্ড, ও একবিংশ খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৬)। গীতবিতান, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা

২৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। আত্মপরিচয়, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

২৮. সরকার আমিন (২০১১)। রবীন্দ্রনাথ : ক্ষণিকা, মূর্ধন্য, ঢাকা

২৯. সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (২০১৪)। [সংকলন, সম্পাদনা ও তথ্য সমাবেশ] রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন এক অমিমাংসিত সংলাপ। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৩০. সুকুমার সেন (১৩৯০)। রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

৩১. সৈয়দ আলী আহসান (২০১৪)। রবীন্দ্র কাব্যপাঠ, মূর্ধন্য, ঢাকা।

৩২. স্টিফেন ডব্লু. হকিং (২০১৬)। কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে কৃষ্ণগহ্বর [ভাষান্তরঃ শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত]। বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা।

প্রবন্ধ

১. ফারুক ফয়সাল (২০১৩)। মুহূর্তেই বাঁচো, কালের খেয়া, মুহূর্ত, সমকাল, ২৮ জুন ২০১৩। পৃষ্ঠাঃ ১১

২. বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৪)। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ প্রত্যয় ও প্রাতিস্বিকতা, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ ৩৮, সংখ্যাঃ ১, অক্টোবর, ১৯৯৪। পৃষ্ঠা নম্বরঃ ১৩৯-১৫৬।

৩. রোকসানা গুলশান (২০১৫)। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মহামানব ও মুক্তি, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ : ৫৩, সংখ্যা : ১, অক্টোবর, ২০১৫। পৃষ্ঠা নম্বরঃ ১৩-৩৭

৪. শামসুল ফয়েজ (চৈত্র ১৪২৪)। সময়ের হাতে চাবিকাঠি, কালি ও কলম, ১৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা। পৃষ্ঠা নম্বরঃ ৮১

৫. সন্‌জিদা খাতুন (২০১১)। সঙ্গীতে রবীন্দ্র চিন্তাধারা, বাংলাদেশের হৃদয় হতে, বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৪১৮, ছায়ানট, ঢাকা। পৃষ্ঠা নম্বরঃ ১৩-৩৩

৬. সিরাজ সালেকীন (২০১১)। সোনার তরী থেকে নৈবেদ্য : আত্মপরিচয়ের আলো, বাংলাদেশের হৃদয় হতে, বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ছায়ানট, ঢাকা। পৃষ্ঠা নম্বরঃ ৪৬-৫৯

৭. সিরাজ সালেকীন (২০১০)। আলোর পানে প্রাণের চলা, উলুখাগড়া, ১৩ সংখ্যা, ঢাকা। পৃষ্ঠা নম্বরঃ ১২৯-১৫৬

৮. এ. এম. হারুন অর রশীদ (২০১০)। রবীন্দ্রনাথ, স্পিনোজো ও আইনস্টাইনের ঈশ্বর-ভাবনা, কালি ও কলম, সার্ধশতজন্মবর্ষে রবীন্দ্রনাথ, ৭ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ২০১০। পৃষ্ঠা নম্বরঃ ৪১-৪৭

9. Time (Special Edition) on Mindfulness. Why every mind needs mindfulness, Mary Elezabeth Williams. Page: 9-14.